আন্দামান ভ্রমণ – ২০১৮
ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার

আন্দামান ভ্রমন (1)

আন্দামান ভ্রমন সেরে বাড়ী ফিরেছি গতকাল বিকেলে (22.2.2018)। ওখানে থাকতে থাকতেই গৌতম দাশগুপ্তবাবু বলেছেন, পরের বইটা শুধু ভ্রমন কাহিনী নিয়েই লিখতে। শুনেই আমার ছেলে বলেছে, আন্দামান নিয়ে লেখা দায়সারা ভাবে লেখা চলবে না। ফেরার সাথে সাথে রুবি দিদিমনি আর রাজীববাবু আন্দামান ভ্রমণ নিয়ে লিখতে শুরু করতে বলেছেন। একটা সমস্যায় পড়াগেল। কি লিখব সেটা কোন সমস্যা নয়; সমস্যা হল কতটা লিখব। এই ছয় রাত্রের ভ্রমণ কাহিনী নিয়েই একটা প্রমান সাইজের বই হয়েযায়। বাস্তবে আমার মেজদারই বই আছে আন্দামান ভ্রমণ নিয়ে।

এর মধ্যেই দুএকজন এই ভ্রমণ নিয়ে যে সব তথ্য জানতে চেয়েছেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সেই তথ্যগুলিই আগে লিখি। অবশ্য গুগুলদাদা সবই জানেন। ওনার জানাতেও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ তথ্য মহাসাগর থেকে নিজের দরকারি তথ্যগুলি খুঁজে বেরকরার থেকে আন্দামানের সমুদ্রের তলা থেকে প্রবাল সাম্রাজ্যের ছবি তুলে আনা সহজ। ভ্রমণের পরে সেসব জায়গা কেমন লাগল, এ খবর বলাটাও বেশ সহজ নয়। আমার যা দারুন ভালোলাগে, আপনার সেটা বিরক্তিকর লাগতেই পার। ঐ আমার আগে লেখা," ধনিয়াপাতা থিওরী " আর কি! আমার ঠিক যে জন্য যে জায়গাটা ভালোলাগল, আর একজনের ঠিক ঐ জন্যই জায়গাটা খারাপ লাগতেই পারে। এই যেমন ধরুন, হ্যাভেলক দ্বীপের রাধানগর সমুদ্র তট। লোকে বলে এশিয়ার সবথেকে সুন্দর সী বিচ। আমার তেমন ভালোলাগেনি। আমার তো ঐ হ্যাভেলক দ্বীপের এলিফ্যান্ট বিচ সবথেকে সুন্দর মনে হয়েছে। মাত্র চরদিন আগেই আমার বন্ধু সুজিত হ্যাভেলক দ্বীপে গেলেও ঐ এলিফ্যান্ট বিচে যায়ই নি।

যে কোন বেড়ানোর জায়গা সম্বন্ধেই বলা যায়, " যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?" এর উত্তরেও সেই ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপারই এসে যায়। যদিও আমার এ লেখা যে বা যাঁরা পড়ছেন, ধরেই নেওয়াযায় যে তাঁরা ভ্রমন পছন্দ করেন। তবে কিনা সাধ আর সাধ্যের মধ্যে ফাঁকটা সব সময় তো পূরণ করা সম্ভব হয় না। আমিও তো এই আন্দামান ভ্রমণের আগে আর্থিক ব্যাপারটি কয়েকজনের কাছে বোঝার চেষ্টা করেছি। এটিই কিন্তু বেশীরভাগ লোকের কাছে সবথেকে জরুরী তথ্য। আমার ক্ষমতা মত, আমি যে পয়সায় ছয় রাত্রের একটা ভ্রমণ সেরে এলাম, সেটাই জানাই।

আন্দামান ভ্রমণের প্রথম পদক্ষেপটি হল, এরোপ্লেনের টিকিট কাটা। এখন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান ছাড়াও বেশ কয়েকটি বেসরকারী কোম্পানির বিমান কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার যাতায়াত করে। আমি প্রায় চার মাস আগে চার জনের যাতাযাতের টিকিট কাটি, স্পাইসজেট কোম্পানির। বিয়াল্লিশ হাজারের একটু বেশী লেগেছিল।

বিমানের টিকিট যতো আগে কাটাযায় ততোই সস্তা হয়, এতো সবারই জানা। তবুও চারমাস আগে টিকিট কাটা সব সময় সম্ভবও নয়। চারজন সদস্য চার মাস পর সুস্থ থাকার নিশ্চয়তা চাই। রেলের মত বিমানের টিকিট ক্যানসেল করাযায় না।

এর পরের ব্যাপারটি হল, কত দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি। এক রাত বেশী মানেই চারজনের এক রাতের জন্য দুটি হোটেলের রুম ভাড়া বেশী খরচ। আমার মত একেবারে ভেতো বাঙালীর তিন তিন ছয় হাজার টাকা খরচ বাড়ে। আমার এবারের ছয় রাত্রের আন্দামান ভ্রমণের জন্য ট্যুর কোম্পানি ষাট হাজার টাকা নিয়েছে। এতে ছিল হোটেল ভাড়া, গাড়ী ভাড়া, জাহাজ ভাড়া আর কয়েকটা শো ইত্যাদির টিকিট। আমরা খাওয়ার খরচ আর জলে নেমে সমূদ্রতল দেখার সব খরচ নিজেদের পছন্দ মত করেছি। এটাই দস্তুর। এই দিকটাতে আমাদের চারজনের তিরিশ হাজার টাকা মত খরচ হয়েছে।

এখন কথাটা হচ্ছে, কতদিন লাগবে আন্দামান ভ্রমণের জন্য? আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাঁচশ বাহাত্তরটি দ্বীপ আছে। সাধারন লোকজন থাকে তিরিশটি দ্বীপে। ঠিকঠাক সবটা দেখতে হলে দেড়মাস মত লেগে যায়। আমি ছয় রাত ছিলাম। কেউ সাত বা আট রাত থাকে। এজন্যই, ঐ দ্বীপে যাওয়া হল না; কিংবা ওটাতে এক রাত না থেকে দু রাত থাকা উচিত, এসব চিন্তা অমূলক। সাধারণত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণের জন্য লোকে যায় না। ওখানে থাকার জায়গা প্রায় নেই।

আন্দামান ভ্রমণের জন্য একশ একটা সংস্থা আছে। এখন ইন্টারনেট দেখে চার ছটি কোম্পানির দরদাম দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। দামের ফারাকটা মূলত হয় হোটেলের রুমের মানের জন্য। আমি আন্দামান গ্রেট হলিডেস কোম্পানির সাথে ঘুরে এলাম। একশোতে নিরানব্বই নম্বর দিলাম ওদের।

আন্দামান ভ্রমণ (৩)

লক্ষ্মণপুর বিচে নেমে দেখি একেবারে পাথুরে প্রান্তর। এবড়ো খেবড়ো পাথর ছড়ানো। পাথরগুলি উঁচু নিচু হয়ে এমন একটা অবস্থা যে দু একজন বয়স্কা মহিলা আর এগোলেন না। সমূদ্রের জল বেশ দূরে চলেগেছে। পাথরগুলি কিন্তু ভেজা ভেজা। পাড়ের দিকটা বেশ উঁচু ; ঘন গাছপালা, ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা। অনেক কেয়া গাছে আনারসের মত ফল ধরে আছে। গাইড ছেলেটি জানাল, আদিবাসী লোকজন ঐ ফল সেদ্ধ করে খায়। পরে আমার বন্ধু ডা বৈরাগীর কাছেও শুনেছি, জনজাতী লোকেদের ঐ কেয়া ফল সেদ্ধ করে তার থেকে আটার মত জিনিষ বেরকরে খাদ্য তৈরীর ব্যাপারটি। ডা বৈরাগী এক সময় ঐ রকম জনজাতীর লোকেদের চিকিৎসক হিসেবে চাকরী করেছে ; সেই সময় ঐ কেয়া ফলের আটার তৈরী খাদ্য খেয়েও দেখেছে। পরে যখন পোর্টব্লেয়ারের নৃতত্ব মিউজিয়াম দেখলাম, ওখানে দেখলাম, মডেলের মাধ্যমে ঐ রকম খাদ্য তৈরীর প্রক্রিয়া।

এখানে একটা জরুরী তথ্য জানিয়ে রাখি। সাধারণভাবে আমরা জানি, আন্দামানের আদিম উপজাতি মানে জারোয়া। ঐ দ্বীপপুঞ্জে ছয়টি আদিম উপজাতির মানুষের বসবাস আছে। আমার বন্ধু যে সোমপেন উপজাতির চিকিৎসক ছিলেন, তাদের নাম আমি আগে শুনিনি। নৃতত্ব মিউজিয়ামে সকল উপজাতির মানুষের ছবি ইত্যাদি দেখলাম। আমাদের মত তথাকথিক সভ্য মানুষের বর্বরতা থেকে ওনাদের রক্ষা করার জন্য খুব কড়াকড়ি আছে। ওনাদের কোন ছবি তোলাও দন্ডনীয়। এমনকি একমাত্র নৃতত্ব মিউজিয়ামেই ক্যামেরা নিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ।

অনেকেই বলেছে, আন্দামান ভ্রমণ সেরে এলেন, জারোয়া দেখলেন না! এ যেন সুন্দরবনে বাঘ দেখতে যাওয়া। চিন্তাটা কতোটা অশ্লীল একটু ভেবে দেখবেন। ঐ ছয় উপজাতির মধ্যে নিকোবরীরা পড়াশুনা করে অনেক এগিয়েছেন। কয়েকজন নিকোবরী ডাক্তার ও হয়েছেন।

আমরা আবার ন্যাচারাল ব্রীজের দিকে এগোই চলুন। একেবারে পাড়ের গাছেদের কাছে একটি প্রায় চারফুট লম্বা সামূদ্রীক সাপ মরে পড়ে আছে দেখলাম। আমি ছবিও তুললাম। ওটি সি ক্রেট সাপ। ভয়ংকর বিষধর ; কামড়ালে আর উপায় নেই। ভারতে এসব সামূদ্রীক সাপের কোন আন্টিভেনম নেই। এসব কথা আমাদের ওয়েবপেজ, স্নেকবাইট লাইফসেভারস -এ পাবেন। ঐ ছবিটিও ঐ পেজে দিয়েছি।

হাঁটতে হাঁটতে একটা বাঁক ঘুরতেই বাঁদিকে দেখতে পেলাম ন্যাচারাল ব্রীজ। ছবিতো আগের পর্বেই দিয়েছি। বাঁ দিকের উঁচু পাড়ের সাথে সমূদ্রতটে উঠে আসা পাথরের স্তম্ভকে যেন একটা সেতু দিয়ে জোড়া। ঐ পাথরের উপর গাছ গাছালিও জন্মেছে।

আমরা সুন্দর ভাটার সময় পৌছেছি, ব্রীজের কাছে চলেযেতে কোন অসুবিধা হল না। গোটা সমূদ্রতট যেন পাথর বাঁধানো। মাঝে মাঝে একটা ঢেউ এসে পা ভিজিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্যান্ট গুটিয়ে, চটি বা কিটো পরেই গেছলাম। আন্দামান ভ্রমণ মানে প্রধানত সমূদ্রতটে ঘোরা। এজন্য কিটো বা বর্ষার জুতো পরে যাওয়াই ভালো। জলে না নামলেও সমূদ্রতটে প্রচুর বালি। আর এই নীল দ্বীপের ন্যাচারাল ব্রীজের কাছে গিয়ে নানান রকম সামূদ্রীক প্রাণী দেখতে হলে জলে ভেজা প্রবাল পাথরের উপরে হাঁটতে হবে। আন্দামানের দ্বীপগুলির প্রায় সবই এই প্রবাল পাথরে তৈরী। বস্তুত এই ন্যাচারাল ব্রীজও হাজার হাজার বছর আগে সমূদ্রের তলায় প্রবাল হয়েই তৈরী হয়েছে। পাথরের ব্রীজের উপর পাছপালা দেখলেই বোঝাযায় পাথরের ভেতর শেকড় চালানোর মত ফাঁক আছে। ঐ গাছে একটি সামূদ্রিক পাখি বাসা করে বসে ছিল, বলেছি সে কথা।

গোটা চত্তরে ছড়ানো প্রবাল পাথরের মাঝে মাঝে যে খানা খন্দ আছে তাতে টলটলে পরিস্কার সমূদ্রের জল আটকে থাকে। আর থাকে নানাধরণের প্রাণী। গাইড ছেলেটি আমাদের কাছে বিস্কুট আছে কিনা জানতে চাইল। বিচের কুকুরদের দেওয়ার জন্য যে বিস্কুট কেনা হয়েছিল, তার কয়েকটা ছিল। দশ ফুট বাই দশ ফুট মত একটা জায়গায় দু আড়াই ফুট গভীর জল আটকে ছিল। গাইড ছেলেটি বলল, ওইখানে বিস্কুটের গুঁড়ো ফেলুন, দেখবেন মাছেদের লড়াই লাগবে। আমার স্ত্রী বিস্কুটের গুঁড়ো ফেলতেই কয়েকশ মাছের হুটোপুটি লাগল। সবথেকে বড়গুলি তিন চার ইন্চি সাইজের তেলাপিয়া মাছের মত। আরও অনেক ছোট ছোট মাছ এসেগেল বিস্কুটের গুঁড়ো খেতে। এই মাত্র মিনিট দুয়েকের একটা ঘটনা আমার মনে, হিন্দু দর্শনের একটা গভীর জিনিষ ঢুকিয়ে দিল। মাত্র বারো ঘন্টা পর জোয়ার এসে ঐ ছোট্ট জলের খন্দটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ওখন ঐ ছোট্ট মাছগুলিও মহাসিন্ধুর ডাক পাবে। আমাদের এই সত্তর আশি বছরের জীবনের ওপাড়ে যে মহাসিন্ধু পড়ে আছে, আমরা কি তার অস্তিত্ব ভুলে ঐ মাছগুলির মত সামান্য বিস্কুটের গুঁড়োর জন্য মেতে আছি?

এই দেখুন, কদিন ছুটি নিয়ে একটু হালকা মেজাজে ছুটি কাটাতে গিয়ে, এসব গুরুগম্ভীর কথা কেন বাপু? ক্ষ্যামা দাও। ভ্রমনের এই এক পার্শপ্রতিক্রীয়া। তুশার ধবল হিমালয় বা সুনীল সাগরের তীর আপনাকে মাঝে মাঝেই দার্শনিক করে তুলবে। নিজেদের ক্ষুদ্রতাকে বুঝতে পারি, এই সব বিশাল বিপুলের কাছে গেলেই। এই নীল দ্বীপের অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়েই, আমার এক বয়জ্যেষ্ঠা এরকম অনুভবের কথা বলেছেন; সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

প্রবাল পাথরের ছোট ছোট গর্তের ভেতর সমূদ্র জোঁক দেখাল, গাইড ছেলেটি। না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওরা ডাঙার জোঁকের মত মানুষকে আক্রমণ করে না। পাথরের গর্তেই আটকে থাকে। ঐ রকম গর্তের ভেতরেই দেখাল, সি অর্চিন নামের কালো কাঁটায় ঘেরা একরকম প্রাণী। গাইড সাবধান করল, হাতে পায়ে ঐ কাঁটা ফুটলে পেকে উঠবে। পরে পোর্টব্লেয়ারের মেরিন মিউজিয়ামে ওদের পূর্ণ অবয়বটা দেখলাম।

একটা জীবিত সমুদ্র শশা হাতে নিয়ে দেখাল গাইড। সেমি সাবমেরিন থেকে দেখে ওদের শশা আকৃতির পাথর মনে হয়েছিল। দীঘার সমূদ্রতটে আমরা ষ্টার ফিস বা তারা মাছ দেখেছি। এখানেও দেখলাম। কিন্তু একেবারে অন্য রকম। দু রকম তারামাছ একেবারে হাতে নিয়ে দেখিয়ে আবার জলে ছেড়ে দিল।

অনেক পাথরের গর্তেই অক্টোপাশ ঢুকে আছে মনে হল। গর্ত থেকে শুধুই দুটি শুঁড় একটু বেরকরে নাড়ছে। অন্য একজন গাইড একটি রঙীন কাঁকড়া ধরেফেলল, সবাই দেখার জন্য জড়ো হলাম। ছবিও তুললাম। জলের ভেতর অর্কিডের ফুলের মত আটকে আছে, পাথরের গায়ে। গাইড আমার ছেলেকে ছুয়ে দেখতে বলল।ছোয়ার সাথে সাথেই, লজ্জাবতীর মত গুটিয়ে একেবারে প্রায় ভ্যানিস হয়ে যাচ্ছে। আমরা ভিডিও তুললাম।

আরও একরকম সুক্ষ্ম লজ্জাবতীর মত এলগি, পাথরের গায়ে ছুয়ে দেখলাম। একদিকে দেখলাম দুটি ছেলে হাঁটু জলে নেমে একটা বড় পাথরকে ঠেলে নাড়ানোর চেষ্টা করছে। তাই দেখে আমাদের গাইড ছেলেটিও হাত লাগাল। একটু দুরের থেকে দেখলাম, একটা কি জিনিস হাতে নিয়ে ওদের একজন সকলকে দেখাচ্ছে। আমরাও এগিয়ে গেলাম। এবার কিন্তু আমাদের চমকের পালা। সাথে সাথে নিজের অজ্ঞতাকে আবারও আবিস্কার করলাম। যে শুঁড়গুলিকে অক্টোপাশের শুঁড় ভাবছিলাম, ওগুলো আসলে পাঁচ শুঁড়ওয়ালা একটা তারা মাছ। ছবি তো উঠলই। জলে ছেড়ে ভিডিও তোলাও হল।

এসব প্রাণী দেখা ইত্যাদি করতেই এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। এরপর যেতে হবে, এই নীল দ্বীপের বিখ্যাত সান সেট পয়েন্ট। ফেরার রাস্তা ধরলাম। একটা কুড়ি বাইশ বছরের গাইড ছেলের কাছে অনেক সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে শিক্ষা পেলাম। কিন্তু তার থেকেও যে বড় শিক্ষাটা ওরা দুজন আমাদের দিল, আমাদের মত তথাকথিক শিক্ষিত মানুষদের সে শিক্ষার জন্য, " বেত্র ব্যবহারই " জরুরী। আমাদের গাইড ছেলেটি আমাদের সাথে ফিরে আসছিল ; পেছন থেকে ওকে ডাকল আর একটি গাইড। একটা প্লাস্টিক জলের বোতল কেউ সমূদ্রতটে ফেলে গেছল, ওটা তুলে,দুমড়ে মুচড়ে পিছনের ছেলেটি ছুড়ে দিল এর দিকে। ওটা নিয়ে ছেলেটি ফিরে এল, নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার জন্য। আন্দামানের যে কটা দ্বীপ ঘুরেছি, সব জায়গায়ই দেখেছি, ওরা প্রকৃতি আর পরিবেশ রক্ষায় খুবই আন্তরিক। আমরা শহুরে লোকেরা নির্লজ্জের মত যত্র তত্র প্লাষ্টিক ফেলে আসছি। জব্বলপুরের মার্বেল রকের নর্মদায় বোটিং করার সময়ও দেখেছি, টলটলে পরিস্কার জলে প্লাষ্টিকের বোতল ছুড়ে ফেলল নৌকা থেকে।

আন্দামান ভ্রমণ প্রথম পর্ব আমার টাইম লাইনে পাবেন, ২৫ শে ফেব্রুয়ারি। আর দ্বিতীয় পর্ব ৩রা মার্চ। (ক্রমশ)

আন্দামান ভ্রমণ (৪)

নীল দ্বীপের এই ন্যাচারাল ব্রীজ এর অবস্থান, লক্ষ্মণপুর এক নম্বর সমুদ্রতটে। লক্ষ্মণপুর দুই নম্বর সমুদ্রতটে সূর্যাস্ত দেখার জন্য সবাই জড়ো হয়। আমরাও চললাম।

এখানে নীল দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানটি একটু জেনে নেওয়াযাক। আন্দামানের প্রধাণ দ্বীপ যেখানে পোর্টব্লেয়ার শহর, সেখান থেকে জাহাজে করে দু ঘন্টা উত্তর পুর্বে হ্যাভেলক দ্বীপ। হ্যাভেলকের রাধানগর সমুদ্রতট পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়াও দশ মাইল লম্বা হ্যাভেলকে আরও গোটা ছয়েক বিচ আছে। হ্যাভেলকের থেকে এক ঘন্টা জাহাজে দক্ষিণদিকে গেলে এই নীল দ্বীপ। এটি লম্বা চওড়ায় মাত্র দু কিলোমিটার করে।

নীল দ্বীপেও রামপুর, ভরতপুর আর লক্ষ্মণপুরের দুটি, মোট চারটি বিচ আছে। আমরা সকালে সাড়ে দশটা নাগাত পৌছেছি। হোটেলে ব্যাগপত্র রেখেই চলে গেছলাম ভরতপুর বিচে। গাড়ীতে পৌছনোর সময় ড্রাইভার ছেলেটিই বলেছিল, এখন জোয়ার চলছে; জলের ভেতরের যা কিছু করবার এখন করে নিন। এখানে দেখলাম, সমুদ্রের তট থেকে পাড়ের ওপরের অনেকটা পর্যন্তই বালি ছড়ানো। গাছের ছায়ায় ছায়ায় অনেক গুমটি দোকান। ডাব, কোল্ড ড্রিংক্স থেকে শুরু করে মাছ ভাতের দোকান সবই আছে।

বালির উপর বড় বড় পলিথিন পেতে লোকের বসার ব্যবস্থা করেছে নৌকাওলারাই। আমরা একটা গ্লাশ বটম নৌকায় ওঠার জন্য পাঁচশ টাকা করে চারটি টিকিট কাটলাম। আমাদের সাথে আর একজন ভদ্রমহিলাও চললেন। ওনার স্বামী নৌকায় চাপবেন না। আমাদেরই বললেন, ওনার স্ত্রীকে একটু দেখতে। পরে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভদ্রলোকের নৌকায় না ওঠার কারন কি? বাচ্চা নিয়ে পাড়ে বসে থাকা? না, কোন বাচ্চা ওদের সাথে ছিল না। ভদ্রলোকের জলে ভয়, তাই ঐরকম ছোট নৌকায় ওঠেন নি। আমরা সবাই ভেসে থাকার লাইফ জ্যাকেট পরে নিয়ে উঠে পড়লাম নৌকায়। জল ছিটে হাতের ক্যামেরা বা মোবাইল ভেজাবে কি না জানতে চাওয়ায়, মাঝি, না বলল। আগের দিনই এলিফ্যান্ট বিচ থেকে ফেরার সময়, জল ছিটে ভিজিয়ে দিয়েছিল। ভরতপুরেও হাওয়া আর ঢেউ দুইই ছিল। জল একটু আধটু ছিটলেও,একেবারে স্নান করার মত ছিল না।

এই গ্লাশ বটম নৌকায় দুপাশে পাঁচ ছজন করে বসার জায়গা থাকে। পায়ের কাছটা স্বচ্ছ কাঁচের তৈরী। ঐ কাঁচের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের তলার প্রবাল সাম্রাজ্যের শোভা দেখা যায়। প্রবালের ফাঁকে ফাঁকে খেলে বেড়ানো নানান রকম রঙীন মাছ দেখতে দেখতে আধ ঘন্টা কখন যেন পেরিয়ে যায়। নৌকা চলে পিছনে লাগানো ইয়ামাহা ইঞ্জিনে। মাঝি পিছনে বসেই নৌকার গতি আর গন্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। ওরা জানে কোথায় গেলে ভাল প্রবাল বা মাছ দেখা যাবে। যেখানে ভাল মাছ দেখা যায়, সেখানে নৌকার গতি মন্থর করে আমাদের দেখার সুযোগ করে দিচ্ছিল মাঝি।

ভরতপুর বিচের কাছেও জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলের রং খুব সুন্দর আর ঝকঝকে স্বচ্ছ। পাড়ের থেকে একশ দেড়শো গজ দূর পর্যন্ত সবুজাভ নীল; তারপর দূরের সমুদ্র ঘন নীল। পরে বুঝেছিলাম, যেখানে জলের নিচে কয়েক ফুটের গভীরেই প্রবাল থাকে, সেখানে সমুদ্র ঐ রকম সবুজাভ নীল দেখায়। গ্লাশ বটম নৌকায় বসে নিচের দিকে তাকিয়ে প্রবাল পাথরের দুরত্ব নৌকা থেকে মাত্র কয়েক ফুটই মনে হচ্ছিল। পাড় থেকে তিনশো গজ মত দূরে একটা দুধ সাদা মাস্তুল লাগানো নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ছোট্ট গ্লাশ বটম একেবারে ওর কাছে পৌছে গেল। মাঝি বলল, ওটা অস্ট্রেলিয়ান নৌকা, প্রতি বছরই আসে। ঐ নৌকার একজন নাকি আমাদের মাঝিকে কখনও বলেছে, ওরা ঘর বাড়ী বিক্রী করে এরকম একটা নৌকা নিয়ে গোটা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। একজন নাকি ছ মাস ছাড়া একবার ডাঙায় নামে। পরে এরকম গোটা দুই নৌকা পোর্টব্লেয়ারের কাছেও দেখেছি।

অস্ট্রেলিয়ান সাহেবের মত নৌকা নিয়ে গোটা পৃথিবীর সব সাগর মহাসাগর ঘোরার সম্ভাবনা আমার বা আপনাদের কারোরই বোধহয় নেই। আমি আগেও পড়েছি, এবার আন্দামানে যাওয়ার আগেও শুনলাম, জাহাজে চড়লে প্রায় সবারই সি সিকনেস হয়। জাহাজের দুলুনিতে গা গোলায়। অনেকেরই বমি হয়। অদ্ভুতভাবে এই আন্দামান ভ্রমণের সময় আমরা বার তিনেক জাহাজে আর একদিন বড় লঞ্চে করে সমুদ্রে কয়েক ঘন্টা ঘুরলাম; আমাদের চারজনের কারোরই ওসব সমস্যা হয়নি। সম্ভবত আমাদের সৌভাগ্য,ঐ সময় সমুদ্র তেমন উত্তাল হয়নি।

অদ্ভুত কান্ড হল এই ভরতপুরে গ্লাশ বটম নৌকায় চড়ে। মিনিট কুড়ি ঘোরার পর,শেষ দশ মিনিট আমার বেশ গা গোলাচ্ছিল। হতে পারে আমার ঘাড়ে স্পন্ডাইলোসিস থাকায় অনেকক্ষন ঝুঁকে দেখার জন্য ওরকম হয়েছিল। পরে আমার মেয়েরও ওরকম হয়েছে শুনলাম। এই গ্লাশ বটম নৌকায় চড়ে সমুদ্রের তলাটা দেখার পর মনে হয়েছে, অত খরচ করে সেমি সাবমেরিনে না চড়লেও বিশেষ ক্ষতি হত না। এখানে পাঁচশ টাকা দিয়ে যা দেখা গেল, সেমি সাবমেরিনে সাড়ে আঠারশো টাকায় ঐরকমই দেখেছি। অবশ্যই ওটাতে এয়ার কন্ডিসন্ড কেবিনে বসে দেখা হয়।

আমাদের নৌকার সহযাত্রী মহিলার স্বামীর মত লোকেদের জন্য সেমি সাবমেরিন আদর্শ। ওখানে আর একটা সুবিধা পাওয়া যায়; একজন মহিলা মাইক নিয়ে কোথায় কি দেখা যাচ্ছে, ধারা বিবরনী দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এখানেই আবার একটু অর্থনৈতিক ব্যাপারটা মনে করিয়ে দিই। জংলীঘাট জেটি থেকে রস আর নর্থবে দ্বীপ দুটিতে যাওয়ার জন্য লঞ্চ ধরতে গেলাম সকালে আটটা নাগাত। গিয়ে দেখি গাড়ী আর মানুষের ভীড়। অনেকে হাতে একটা করে রঙীন বিল বই নিয়ে কিসের যেন টিকিট বিক্রী করছে। আমাদের টিকিট কেটে রেখেছে ট্যুর কোম্পানির লোক; তাই তার জন্য অপেক্ষা করলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ছেলেটি এসে গেল। ও আমার ছেলেকে মার্ক মেরিনা লঞ্চের চারটি টিকিট দিয়ে বলল, অন্য কিছু ওয়াটার আক্টিভিটি করলে তার বুকিং এখানেই করতে হবে। ঐ বিল বইওয়ালা একজনের সাথে কথা বলতে বলল। এই একটা জায়গায় দেখলাম, নানান ভাবে বুঝিয়ে টিকিট বিক্রীর চেষ্টা চলছে। ও-ই বুঝিয়ে সেমি সাবমেরিনের চারটি টিকিট আমাদের বিক্রি করল।

কিন্তু স্কুবা ডাইভিং করার জন্য আমার ছেলে মেয়ে হ্যাভেলকে সময় নির্ধারণ করে রেখেছিল, তাই এদের অনেক বোঝানোতেও রাজী হল না। বস্তুত একটু কম বয়সিদের কাছে এই স্কুবা ডাইভিং একটা দারুন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এজন্যে ওরা ভালো রকম খোঁজখবর নিয়েই, হ্যাভেলকের গোবিন্দনগরের স্কুবা ডাইভিং সেন্টার ঠিক করেই নিয়েছিল। আন্দামানে আমরাই তো গোটা ছয়েক জায়গায় স্কুবা হচ্ছে দেখলাম। একই ভাবে নর্থ বে ছাড়াও এলিফ্যান্ট বিচে সি ওয়াক হয়। কিন্তু জংলীঘাটের ছেলেগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছিল, গোটা ভারতে একমাত্র নর্থ বে তেই হয়। আমরা যেহেতু কেউ সি ওয়াক করিনি, তাই বলতে পারছি না, স্কুবা ভাল না এটা।

দেখুন, কথায় কথায় আপনাদের নীল দ্বীপের ভরতপুর বিচের থেকে পোর্টব্লেয়ারের জংলীঘাট জেটি, সেখান থেকে কোথায় কোথায় যেন ঘুরিয়ে আনলাম। ভরতপুরে গ্লাশ বটম নৌকায় ঘোরাহলে, তীরে এসে একটা গুমটিতে চা খেলাম। বালির ওপর পাতা পলিথিনে না বসে ঐ চায়ের দোকানের সামান্য মাচায় বসে সমূদ্র দেখছিলাম। এক ভদ্রলোক দেখলাম জলে নেমে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছেন। অনেক দূর, অন্তত একশ গজ চলে গেলেও জল ওনার হাঁটুর ওপরে হচ্ছে না। পরদিন সকালে দেখেছি, ভাটায় জল নেমে আরও দূরে চলেগেছে। জেগে আছে পাথুরে প্রান্তর।

আমাদের গাড়ী , আমাদের ন্যাচারাল ব্রীজ দেখা হলে, লক্ষণপুর বিচ থেকে সানসেট পয়েন্টে নিয়ে চলল। গ্রামের গাছপালা, নারকেল বাগান, সুপারী বাগানের ভেতরের সরু বাঁধানো রাস্তা দিয়ে মিনিট দশেকেই একটা জায়গায় পৌছে দিল। খুব লম্বা লম্বা একটু কম ডালপালার অনেক গাছেদের তলায় তলায় ট্যুরিষ্টদের গাড়ীগুলি এসে সকলকে নামাতে থাকল। ড্রাইভার বলেদিল, বিচ ধরে বাঁদিকে এগোতে। বিচে গিয়ে দেখলাম, সমূদ্র অনেক দূরে সরেগেছে ভাটায়। কালচে মরা প্রবালের পাথরে ঢাকা প্রান্তরের ওপারে নীল জল, অন্তত দুশো গজ দূরে। বাঁদিকে পাড়ে কেয়া গাছের ফল, আনারসের মত দেখতে। ডান দিকে পাথরের ফাঁকে মাছের খোঁজে ঘোরা দু একটা পাখি, এসব দেখতে দেখতে প্রায় হাফ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে এগোলাম। সানসেট পয়েন্টে পৌছে দেখলাম, বালুচরের ঢাল শেষ হওয়ার পর সেই পাথরের প্রান্তর। সূর্য তখনও বেশ উপরে। একটু পিছিয়ে এসে, ছায়া দেখে, একটা চায়ের গুমটিতে চা বলে, ওদের মাচায় বসলাম।

আন্দামান ভ্রমন (৫)

এই যে সমূদ্রতটের চায়ের দোকানে আধ ঘন্টা বসে থাকা; এর থেকেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দোকানে চা তৈরী করছেন এক মহিলা। তার স্বামী লোকটি ঘুরে ঘুরে লোকজনকে ডাকছে। চা ছাড়াও কলার মোচার পাকড়ো পাওয়া যায়, খেয়ে দেখতে বলছে, এই সব আরকি। ওরাও বাংলায় কথা বলছে। আমাদের পরে আরও অনেকে চা পাকোড়া খেল। সবাই বাঙালী। " রম্যাণি বীক্ষ্য " বইয়ের লেখক, শ্রদ্ধেয় সুবোধ কুমার চক্রবর্তীর একটি অভ্যেস ছিল, তখনকার রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের সাথে আলাপ জমাতেন; তথ্য সংগ্রহের জন্য।

আজকাল অবশ্য ট্রেনে সেভাবে আলাপ জমাতে গেলে, লোকে পকেটমার ভাবতে পারে। এই চা বিক্রেতা লোকটি নিজেই বক বক করছিল। আমারও আধ ঘন্টা মত সময় কাটানোর দরকার ছিল। ওর কথায় যা জানলাম, ওর আদি বাড়ী শান্তিপুরের কাছে কোন গ্রামে। মামার কাছে চলে এসেছিল কোন জীবিকার সন্ধানে। অনেক আগে যারা এসেছিল, তারা জমিজমা পেয়েছে, এদের ওসব নেই। চাষ আবাদ করে কিনা জানতে চাওয়ায় জানাল, আগে সব্জির চাষ হত, এখন রাসায়নিক সার না আসায় চাষ বন্ধ। ওর দোকানে দুধ বিক্রী হচ্ছে ; তাই বললাম, গোবর সারে সব্জির চাষ হয় না? ওর কথায় বুঝলাম ওসব জৈব সার বা জৈব চাষ ওদের অভিধানে নেই। পরে পোর্টব্লেয়ারের রাস্তার পাশে রঙীন ব্যানার দেখেছি, " নীল দ্বীপের টাটকা সব্জি ". নীল দ্বীপে আনিডো অর্থাৎ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুগ্ধ সমবায়ের অফিস দেখেছি। আমার বন্ধু ডা বৈরাগীর স্ত্রী বলছিলেন, নীল দ্বীপে এক সময় দুধ সস্তা ছিল, ডা বৈরাগী ওদিক থেকে পোর্টব্লেয়ার ফেরার সময় দুধ নিয়ে আসতেন।

আমি নীল দ্বীপে কোথাও চাষ দেখিনি। হ্যাভেলকে তবু একটাই জমিতে বাঁধাকপি দেখেছি। শুনেছি ওসব দ্বীপে লোকজনকে বসবাসে উৎসাহী করতে, এক সময় বিনা পয়সায় বিঘার পর বিঘা জমি দেওয়া হয়েছে। এখন ট্যুরিজম এর ব্যবসা করে লোকের হাতে প্রচুর টাকা হয়েছে, ওরা আর চাষ আবাদের কথা ভাবে না। চায়ের দোকানের লোকটিই বলছিল, ঐ সময় বরবটির দাম তিনশো গ্রাম পঞ্চাশ টাকা। এক কাপ চায়ের দাম কুড়ি টাকা হলে, বরবটির ঐ দামই হওয়া উচিত।

আস্তে আস্তে লোক সমাগম বাড়ছিল। একটি বাঙালী পরিবার, সকলেই বেশ শিক্ষিতই মনে হল, চা আর পাকড়োও খেলেন।সকলেরই বয়েস ষাটের উপরই হবে। আমরা সকলেই কাগজের কাপে চা খেয়ে নির্দিষ্ট বালতিতে কাপ ফেলেছি। এক ভদ্রমহিলা বিচের বালির ওপরেই কাপটা ফেললেন। ওনার স্বামীই সম্ভবত, ওনাকে বারবার বলা সত্ত্বেও কাপটা তুলে বালতিতে ফেললেন না। শেষে ভদ্রলোক নিজেই কাপটা তুললেন। ওখানে বসেই লক্ষ্য করছিলাম, এক আধটা কাপ বালতির বাইরে পড়লে, দোকানের লোকটিই তুলে বালতিতে ফেলছিল। ওদের ওখানে আইনের কোন কড়াকড়ি আছে কিনা জানিনা। কিন্তু সমূদ্রতটে ওরকম কোন প্লাষ্টিক বা কাগজ কোথাও পড়ে থাকতে দেখিনি। সূর্যাস্ত দেখার জন্য শ দুই লোক তো হাজির হয়েছিলাম। মোড় ঘুরে বাঁ দিকেও দেখলাম বেশ কয়েকটা ওরকম চায়ের গুমটি আছে। আমাদের স্বভাব মত যথেচ্ছ চায়ের কাপ আর প্লাষ্টিক ছড়ালে, এক মাসেই ঐ সানসেট পয়েন্ট নরক কুন্ড হত নিশ্চয়ই।

এবার সূর্যাস্ত দেখার সময় হল। আমি আধ ঘন্টা আগেই ছেলেকে বলেছিলাম, পশ্চিম দিকে যেখানে সূর্য ডুববে, সেখানে একটা দ্বীপের মত দেখা যাচ্ছে, সূর্য একেবারে সমূদ্রের জলে না ডুবলে দেখে মজা নেই। গোধূলির মায়াবী আলোয় আমাদের পিছনের মানুষজন গাছপালা সব কিছুই সুন্দর লাগছিল। কিন্তু সমূদ্রের জলে গোধূলির অস্তরাগে যে আলতা গোলা রং দেখার আশা করেছিলাম, সেটা হল না। তবুও অনেক ছবি উঠল। অনেকেই প্রবাল পাথরে সাবধানে পা ফেলে ফেলে যতোটা এগোনো যায় এগিয়ে গেল। এখানে একটা পুরনো কথা একটু ঝালিয়ে নিই। মহাত্মা গান্ধী তাঁর, " মাই ফার্ষ্ট ভিজিট টু লন্ডন" রচনায় লিখেছেন, প্রথমবার লন্ডন শহর দেখে উনি খুবই হতাশ হয়েছিলেন। আসলে বৃটিশ রাজের মূল কেন্দ্র সম্বন্ধে ওনার প্রত্যাশা অনেক বেশী ছিল।

এই প্রত্যাশা পূরণ না হয়ে হতাশ হওয়ার ব্যাপারটি আমাদের জীবনে যেমন আকছার ঘটছে, তেমনি এই প্রত্যাশার মাত্রা নিজের আয়ত্তে রাখাটাও কঠিন। এই ভ্রমনের ক্ষেত্রেই যেমন। কেউ একটা কোন জায়গা ঘুরে এসে এমন উচ্ছসিত প্রশংসা করল যে আপনি পরের ছুটিতেই ছুটলেন। গিয়ে হয়তো দেখলেন, একেবারে মামুলী একটা জায়গা। বেশীরভাগ লোকই সুন্দরবন ঘুরে এসে বলে,ধ্যুৎ,বাঘই দেখলাম না। সুন্দরবন যেন আলিপুর চিড়িয়াখানা! নৌকা করে বাবুরা এসেছেন, বাঘ এসে পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, কটা ছবি তুলতে চান তুলে নিন, আমার একটু তাড়া আছে, একটা হরিণ ধরতে যাচ্ছি।

আমি এজন্যই কোন ভ্রমণস্থানেরই উচ্ছসিত প্রশংসা করতে চাইনা। আমার কথা শুনে কেউ পরে গিয়ে হতাশ হলে, আমার রুচি নিয়ে খারাপ ধারনা করতে পারে। সূর্যাস্ত হওয়ার পর একে একে সবাই ফিরে চললাম গাড়ীগুলির দিকে। সানসেট পয়েন্টের কাছে অনেক কটা ছোট আলোর স্তম্ভ আছে পাড়

ঘেঁসে ; হয়তো কোন কোন গেষ্ট একটু অন্ধকার পর্যন্তই থেকে যায়। আমরা সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যার পর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই সোজা হোটেলেই ফিরে এলাম। ড্রাইভার পরদিন সকালে জাহাজ ধরানোর সময়ে আসবে জানিয়ে বিদায় নিল। ওর কাছে একটা তথ্য জানা হয়নি বলে পরে আমার আফশোষ হয়েছে।

যে কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে ভোরে উঠে সূর্যোদয় দেখতে চাই। সমূদ্রে সূর্যোদয় তো খুবই সুন্দর। কিন্তু বেশীরভাগ লোকই ভোরে উঠতে পারে না,তাই সূর্যাস্ত নিয়েই মেতে থাকে। আমাদের হোটেলটি নীল দ্বীপের প্রায় মাঝখানে, গঞ্জের মত জায়গাটায়। আসেপাশেই একটা বাজার, পোষ্ট অফিস, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পুলিশ ফাঁড়ি, দুগ্ধ সমবায়ের কেন্দ্র সবই। রাস্তার পাশে পাশে অসংখ্য নীম গাছ।

আমি ভোরে উঠে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। মিনিট পাঁচ সাতেই পৌছে গেলাম ভরতপুর বিচে। কাল দুপুরের সেই জমজমাট এলাকা যেন নিঝুম পুরী। একটাও লোক নেই। সমূদ্র চলেগেছে বহু দূরে। বিস্তীর্ণ পাথুরে প্রান্তর দেখলে কে বলবে যে ওখানেই কুড়ি ঘন্টা আগে আমরা গ্লাশ বটম নৌকায় চড়ে সমূদ্রের ঢেউয়ে দুলেছি। তা হোক, সমূদ্র তো ভাটায় দূরে সরে যাবেই। আমি হতাশ হলাম, ডান দিকে গাছপালার পেছন থেকে সূর্য ওঠার আভাস পেয়ে। ঐটুকু দ্বীপের পুর্ব দিকের কোন সমূদ্রতটে হেঁটে যেতেই পারতাম। সম্ভবত ওদিকেই সীতাপুর বিচ। এবার আর দেখা হল না। দূরে, বাম দিকে, জেটির দিকে দু একজনকে হাঁটতে দেখে ওদিকেই এগিয়ে গেলাম।

জেটির ওপর একটু কসরত করেই উঠলাম। বাঁদিকে দেখলাম মাছ শুকানোর জায়গা। সাধারনত ওসব জায়গায় মাছের উৎকট দুর্গন্ধ থাকে; এখানে ওসব নেই। সম্ভবত এখনও চালু হয়নি। সকাল সাড়ে ছটার আগেই কিছুলোক জাহাজের টিকিট কাটার জন্য লাইন দিয়েছে দেখলাম, এক দুজন সাহেবও লাইনে ছিল। একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

সকাল আটটায় হোটেল থেকে চেক আউট করে নিচে খাওয়ার জায়গায় নেমে এলাম। এদেরও ব্রেকফাষ্ট কম্লিমেন্টারী। কিন্তু পোর্টব্লেয়ার বা হ্যাভেলকের মত ঢালাও ব্যবস্থা নয়; বেশ সংক্ষিপ্ত। লুচি আর ঘুঘনি। যারা লুচি খাবেনা,তাদের জন্য মুড়ি আর ঘুঘনি। গাড়ী যথা সময়ে এসে আমাদের জাহাজঘাটায় পৌছে দিল। অনেক লোক গেটের বাইরে লাইন দিয়েছে দেখে খোঁজ নিলাম। জানলাম ওটা আগের জাহাজের জন্য, আমাদেরটা নয়। গেটের বাইরে কেয়াপাতায় ছাওয়া বসার ঘরে বসে অপেক্ষা করলাম মিনিট চল্লিশ। একটা মোটা কুকুর বাঁশের বেঞ্চিতে নিশ্চিতভাবে ঘুমাচ্ছে; অর্থাৎ বসার জন্যে বেশী লোক ওই কুঁড়ে ঘরে ঢোকেনা।

ওখানে বসে বসেই দেখেছি, দু জোড়া সাহেব মেম বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। এক জোড়া পোল্যাণ্ডের নাগরীক জানলাম। অন্যরা কোন দেশের জানতে পারিনি। গেটে টিকিট দেখিয়ে লোকজন ঢুকছে দেখে আমরাও জেটিতে ঢুকলাম। এই প্রথম সরকারী জাহাজে উঠলাম। আমাদের টিকিট সাধারণ শ্রেনীর ছিল, তাই নিচে নামতে হল। আগে গ্রীন ওসেন জাহাজে চাপার অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, লোকে বেশী সময় নিচে বসে থাকে না। প্রায় সবাই সমূদ্র দেখার জন্য ওপরে উঠে আসে। এই সরকারী বাষ্পুকা জাহাজে তো নিচের সব সিট ভরলই না। একটু পরে উপরে উঠে দেখি, অনেক যাত্রী খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে সমূদ্র দেখছে আর ছবি তুলছে। রোদের বেশ তেজ ছিল। তাই সবাই একটু ছায়া খুঁজছিল। সমূদ্রের চোখ ধাঁধানো নীল রঙের কয়েকটা ছবি তুলে আমিও নিচে নেমে সিটে বসলাম।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, এক সাহেব তার বড় পিঠের ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছে খোলা ছাদেই। মাথাটাই যা একটু ছায়া পেয়েছে, গোটা শরীর রোদে। সাথের মেমটিও একটু ছায়া দেখে বসে বসে একটা বই পড়ছে। ছাদে বড় বড় ব্যাগপত্র স্তুপাকারে রাখা। আমার ছেলে বলেছিল, সরকারী জাহাজে অনেক সময় বসার জায়গা না পেয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। এখানে তো নিচের অনেক সিট খালিই দেখলাম। সাহেবরা কি তাহলে সিটে না বসে সস্তায় টিকিট কেটেছে? সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, সাহেবরা কেবিনে না গিয়ে, নিচের সস্তার টিকিটেই চেপেছিল।

এবারের মত নীল দ্বীপের ভ্রমণ শেষ করে পোর্টব্লেয়ার ফিরছি। জাহাজে এক ঘন্টা লাগবে। জাহাজে বসে বসে ভাবছিলাম, আমার এক শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা দিদির অভিজ্ঞতার কথা। ওনার বইতে, নীল দ্বীপে থাকার সময় ওনার যে দার্শনিক অনুভুতি হয়েছিল, লিখেছিলেন। ওনার ঐ ছোট্ট দ্বীপে থাকার সময়, এই বিশাল বিপুলের মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ মনে হয়েছে নিজেকে। এই নীল দ্বীপের জায়গাটায় গোটা দেশের মানচিত্রে একটা বিন্দুও হয়তো নেই।

বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগরের বিশাল বিপুল জলরাশির ভেতর ঐ দু কিলোমিটার লম্বা একটা ছোট্ট দ্বীপ তো সত্যিই ক্ষুদ্র। শান্ত মনে মেদিনীপুরের কোন গ্রামের আকাশে নির্জন রাত্রে তাকিয়ে দেখুন; মহাবিশ্বের অনন্ত নক্ষত্র পুঞ্জের মাঝে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অবস্থান চিন্তা করলে মাথা ঝিমঝিম করবে। দিদি তো আবার হাড়ে মজ্জায় রবীন্দ্র অনুরাগিণী। ওনার নিশ্চয়ই কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা মনে এসেছিল। " অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে" ; তাই ওনার প্রাণও বিস্ময়ে জেগে উঠেছিল। কিংবা নীল দ্বীপের কোন বিচ রেসর্টের আঙিনায় বসে দিদি গেয়ে উঠেছিলেন, " বিপুল তরঙ্গ রে"!

আমার বৈশ্য বুদ্ধিতে মনে হচ্ছে, দিদি নিশ্চয়ই কোন বিচ রিসোর্টের অতিথি হয়েছিলেন। রাত্রে জোয়ারের সময় হয়তো দমকা হাওয়ায় ওনার মনে এসেছিল," আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরান সখা বন্ধু হে আমার।" আমরা যেহেতু দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে,দোতলা এ সি হোটেলে রাত্রে থেকেছি, দিদির মত ঐ অতীন্দ্রিয় অনুভুতি থেকে বঞ্চিতই হয়েছি। নিজেকে যদি " দূরদ্বীপবাসিনী" ভাবতে ভালোবাসেন, তাহলে একটু বেশী খরচ করে ওরকম কোন বিচ রেসর্টেই থাকবেন নীল দ্বীপে গিয়ে।

আন্দামান ভ্রমণ (৬) - চিড়িয়াটাপু আর মুন্ডা পাহাড়

নীল দ্বীপের থেকে পোর্টব্লেয়ার ফিরলাম দুপুরে। বিকেলে চললাম চিড়িয়াটাপু আর মুন্ডা পাহাড় দেখতে। এই জায়গাটা আন্দামানের একেবারে দক্ষিনে, পোর্টব্লেয়ার শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে।

দুচার কিলোমিটার যাওয়ার পরই শহর শেষ হয়ে গ্রাম শুরু হল। কোথাও বেশ ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গাড়ী চলল; কোথাও বাম দিকে নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে সমূদ্র দেখা যাচ্ছিল। এভাবেই একটা সময় পৌছে গেলাম চিড়িয়াটাপু। অনেক লম্বা লম্বা গাছের ছায়ায় বেশ কয়েকটা ট্যুরিষ্ট গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। একটা চেকপোষ্ট মত জায়গায় পুলিশের কাছে গাড়ীর নম্বর আর সবার নাম লিখে ভেতরে ঢুকলাম। কয়েকজনকে একসাথে করে গেটের পুলিশ কয়েকটা কথা বলেদিল।

ওখানকার সমূদ্রের জলে কুমির আছে, তাই জলের কাছে যেতে বারন করল। নামতেই যদি হয়, জাল দিয়ে ঘেরা জলেই যেন নামা হয়। ভেতরে একটু এগিয়েই দেখলাম, জলের একটা জায়গা নাইলনের জাল দিয়ে ঘেরা। বিকেলের ভাটা চলছিল, তাই জল একটু দুরে দুরেই ছিল। বাম দিকে পাড়ের দিকে ঘন জঙ্গলের মত। একটু একটু করে পাড়ের জঙ্গল পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। কেয়াগাছের ঝোপের ছায়ায় কয়েকটা বসার বেঞ্চির মতও করার আছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাঁদিকের জঙ্গলের ভেতর একটা পায়ে চলার রাস্তার দেখা পেলাম। যদিও চিড়িয়াটাপু নাম হয়েছে, অনেক পাখি দেখা যেত বলে, আমরা এক দুটির বেশী পাখি দেখিনি।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। আরও দু চারজন চলেছে একই পথে। রাস্তাটাতে অনেক গাছের শেকড় আড়াআড়ি গিয়ে বেশ শিঁড়ির ধাপের মত দেখতে হয়েছে। এক এক জায়গায় জঙ্গল বেশ ঘন। মাঝে মাঝেই এক একটা মহীরুহ এত উঁচু যে মাথা দেখাযায় না। কোন বন্যপ্রাণির কোন চিহ্নও দেখলাম না। এক জায়গায় পৌছে দেখলাম উল্টো দিকে, অনেক নিচে সমূদ্রের ঢেউ এসে গাছের প্রায় গোড়ায় পড়ছে। ওখানেই বসার জন্যে একটা বেঞ্চির মত পেলাম।

গোটা আন্দামান ভ্রমণের এই একটি জায়গায় দেখলাম কিছু প্লাষ্টিকের জলের বোতল আর দু একটা কাগজ বা থার্মোকলের থালা জঙ্গলে ছড়ানো পড়ে আছে। রাস্তাটা ডান দিকে আরও এগিয়ে গেছে। এক দুজন ওদিকে এগিয়ে গেলেও আমরা আর এগোলাম না। ওখানেই কিছু সময় বসলাম। কয়েকটা ছবি তোলা হল। সমূদ্রের দিকে অনেকটা নেমে দেখে এলাম। জল ছুঁয়ে দেখার মত জায়গায় পৌছন গেল না।

এর আগে বিশাখাপত্তনম গিয়ে দেখেছি, পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নীল সমুদ্র দেখা যায়। ওখানে কৈলাশ পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝে রাস্তা আর কিছুটা সমুদ্র তটও আছে। আন্দামানের এই মুন্ডা পাহাড় একেবারে যেন সমুদ্রের জল থেকেই উঠেছে। বিশাখাপত্তনমের কৈলাশ পাহাড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা পার্কের মত করে, রোপওয়ে ইত্যাদি দিয়ে কৃত্রিম মনোরঞ্জক করা হয়েছে। মুন্ডা পাহাড় একেবারে প্রাচীন অবস্থায়ই আছে। পায়ে চলার ঐ রাস্তাটুকু ছাড়া আর কোথাও কোন গাছ, লতাপাতাও কাটা হয়নি। ফেরার পথে দেখলাম, একটা ছোট্ট ফলকে লেখা আছে মুন্ডা পাহাড় ট্রেকিং, ১. ৮ কিমি। আমরা যেখান থেকে ফিরে এলাম,তার থেকে আর তিন চারশ মিটার জঙ্গলের পথে হেঁটে একটা ভিউ পয়েন্টে গেলে হয়তো সমুদ্র একটু ভালো দেখা যেত।

আমরা নামার সময় দেখলাম, জঙ্গলে ঢোকার মুখে যে লোকটি ঘোরাঘুরি করছিল, সে দু একজনকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। সম্ভবত বিকেল চারটের পর আর কাউকে মুন্ডা পাহাড়ে উঠতে দেয় না। গেটের বাইরে,গাছের ছায়ায় অনেক বসার জায়গা তৈরী করা আছে, পার্কের মত। ড্রাইভার বলেছিল, সাড়ে চারটেয় ওখান থেকে রওনা দেবে। কিছু সময় বসে ড্রাইভারকে ডেকে নিলাম। চিড়িয়াটাপু থেকে সানসেট পয়েন্টে যেতে পাঁচ সাত মিনিট লাগল। ওখানে পৌছে কিন্তু বেশ বুঝলাম, এখানেও হতাশ হতে হবে।

নীল দ্বীপের সানসেট পয়েন্টে,পশ্চিমদিকের দ্বীপটি অনেক দূরে হালকা দেখা যাচ্ছিল। সূর্য প্রায় সমুদ্রের জলেই ডুবেছিল। কিন্তু চিড়িয়াটাপুর পশ্চিম দিকের দ্বীপগুলি অনেক কাছেই দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এখানেও যথেষ্ট যাত্রী সমাগম হল। এখানেও ভাটার জন্য সমুদ্র তটের অনেকটা পর্যন্তই পাথর ছড়ানো।

জোয়ার এলে জল ওসব পাথর ডুবে যায়, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। পাড়ের অনেকটাই ভালোকরে পাথরে সিমেন্টে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্দামানে আর কোথাও এরকমভাবে পাড় বাঁধানো দেখিনি (কোভরিং কোভ বিচ ছাড়া) । ডানদিকে একটু টিলা মত। তার ওপরেও বসার জন্য চালামত তৈরী। বেশ বোঝাযায়, জায়গাটাকে ট্যুরিষ্ট স্পট হিসেবে তৈরীর জন্য কর্তৃপক্ষ বেশ সচেষ্ট।

এরকম সাধারন কিছু জায়গাকে, ভিউ পয়েন্ট বা সাইট সিয়িং স্পট করে দেখানো হয়, মিরিকে পেলিংয়ে, আরাকু ভ্যালিতে। ওসব জায়গার গাড়ীওলারা পাঁচটা পয়েন্ট,সাতটা পয়েন্ট এরকম হিসেবে ভাড়া নেয়। চিড়িয়াটাপুর এই সান সেট পয়েন্টও ওরকম একটা মনে হল। সুর্য ডোবার মুখে কয়েক ডজন গাড়ীতে শ খানেক গেষ্ট এসে গেল। আমরা বাঁধানো পাড় ধরে আরও এগিয়ে গেলাম।

অনেকেই তটের পাথরের ওপরে গিয়ে উঠল; হয়তো ভালো ছবি উঠবে বলে। ছবি আমরাও তুললাম। সুর্য ডুবলে ফেরার পথ ধরলাম। কয়েকশো মিটার গাড়ী চলবার পর ড্রাইভার একটা জায়গার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। জানাল ওখান থেকে আন্দামানের কিলোমিটার মাপ শুরু হয়। মানে ওটা আন্দামানের জিরো পয়েন্ট। ওখান থেকে পোর্টব্লেয়ার ছাব্বিশ কিলোমিটার। একটু জন বসতি শুরু হতে ড্রাইভারকে বললাম, একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়াতে। পোর্টব্লেয়ারের শহরতলীর একটা ছোট্ট বাজার মত জায়গায় একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গাড়ী দাঁড়াল। দোকানের মহিলা দক্ষিন ভারতীয় মনে হল। আন্দামানে মিষ্টির দোকান খুব একটা চোখে পড়েনি। নীল দ্বীপের রসগোল্লার খুব সুখ্যাতি শুনেছি। ফেরার সময় জাহাজঘাটার কাছে ভ্যান রিক্সায় একটা বড় প্লাষ্টিকের জারে রসগোল্লা বিক্রী হতে দেখেছি। ওরকম রসগোল্লার জার মাথায় নিয়ে একজন ঘুরছিল এলিফ্যান্ট দ্বীপেও। কোন জায়গায়ই আমাদের আর খেয়ে দেখা হয়নি।

আমরা পোর্টব্লেয়ারের শহরতলীর দোকানে যে সব লাড্ডু বা বরফি জাতীয় শুকনো মিষ্টি দেখলাম, ওরকম সাধারনত উত্তর ভারতের শহরে দেখাযায়। ঐদিন সন্ধ্যায় আমাদের আমার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিল, তাই সোজা হোটেলে ফিরে এলাম।

আমার সহপাঠী এই ডাক্তার বন্ধু পোর্টব্লেয়ারের পুরনো বাসিন্দা। নিজে গাড়ী চালিয়ে এসে আমাদের সকলকে ওর বাড়ী নিয়ে গেল। তিরিশ বত্রিশ বছর পর সহপাঠী বন্ধুর সাথে দেখা হল; খুবই আনন্দ হল।ওর বাড়ীতে ঘন্টা তিনেক ছিলাম। নিজেদের পারিবারিক আর ব্যক্তিগত নানান গল্পের বাইরেও অনেক তথ্য জানাগেল, আন্দামানের আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেরও। আমার বন্ধু বেশ কয়েক বছর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চাকরী সূত্রে থেকেছে। এমন অনেক তথ্য জানাগেল যা, গুগুলদাদাও বলবেন কিনা জানিনা। পরেরদিন আন্দামানের বিখ্যাত নৃতত্ত্ব মিউজিয়ামে ঘুরে ওখানকার আদি বাসিন্দা জনজাতীগুলির সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। কিন্তু আমার বন্ধু নিকোবরের সোমপেন উপজাতির চিকিৎসক ছিলেন। তাই ওদের সাথে মিশে ওদের জীবনযাত্রা খুব কাছে থেকে দেখেছে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, এই সোমপেন উপজাতির মানুষের কথা ঐদিন সন্ধ্যায় প্রথম জানলাম। পরের দিন মিউজিয়ামে আরও পাঁচটি উপজাতির কথা জানলাম। একমাত্র এই সোমপেন উপজাতির মানুষের গায়ের রং আমাদের মত। ওদের দেখতে অনেকটা থাইল্যান্ড বা আমাদের মণিপুরের বাসিন্দাদের মত। আমার বন্ধু ২৫-৩০ বছর আগে যখন ওদের চিকিৎসা করত, ওদের ভাষা কেউ জানত না। আমাদের ভাষাও ওরা বুঝত না; সবই চলত ইশারায়। ওদের কুঁড়ে ঘরের ছবি আর মডেল মিউজিয়ামে দেখেছি। বন্ধুর কাছে সোমপেন উপজাতির জীবনযাত্রার একটা অদ্ভুত জিনিষ শুনলাম। বড় কলা পাতায় ভাত ঢেলে, অনেকে এক পাতেই খেত। আরও বিশেষ ব্যাপার ছিল, দু হাত দিয়েই ভাত খাওয়া। এখন ওদের ভাষার ব্যাপারটা কি অবস্থায় আছে জানতে পারিনি।

আমাদের অনেকেরই ধারনা ছিল বিগত সুনামিতে আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সব জায়গায়ই ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ধারনাটা ভুল। ক্ষতি শুধু নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেই হয়েছিল। আন্দামানের প্রায় কোন ক্ষতিই হয়নি। একটা কারন সম্ভবত, আন্দামানের দ্বীপগুলির উচ্চতা। পোর্টব্লেয়ার শহরতো ছোট খাট পাহাড়ী শহরের মত। প্রথমদিনই এয়ারপোর্টের থেকে হোটেলে যাওয়ার সময় দেখেছি, রাস্তাগুলি পাহাড়ী রাস্তার মত চড়াই উৎরাই।সেলুলার জেলের লাইট এন্ড সাউন্ড থেকে জানলাম, সমুদ্র থেকে ষাট ফুট উপরে ঐ জেলখানা তৈরী হয়েছিল। হ্যাভেলক বা নীল দ্বীপেও সুনামিতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। (চলবে)

আগের পর্বগুলির লিংক নিচে।

https://www.facebook.com/dayalbandhu.majumdar/posts/1857395800946747

"আন্দামান ভ্রমন (পর্ব ৮) সেলুলার জেল "

জীবনে তো কতোকিছুর জন্যই আফশোস থেকে যায়। আমার একটি ব্যাপারে আফশোস, আজ ২৯ শে এপ্রিল, সকালে রেডিওটা চালিয়েই আবার মনে পড়ল। আজ প্রনম্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রয়াত বিমল দাশগুপ্ত মহাশয়ের পবিত্র জন্মদিন। মেদিনীপুর শহরে বছর সাতেক থাকার সময়, কলেজ মোড়ে এই প্রণম্য বিপ্লবীর বাড়ীর সামনে দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছি। প্রথম দিকেই এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, ঐ জায়াগায় থাকেন ঐ মহান বিপ্লবী। একবার প্রণাম করতে যাবো, বলেও ছিলাম ঐ বন্ধুকে। এখন পিছন দিকে তাকালে ভাবি, কি বিচিত্র সব কাজে আর অকাজে প্রায় সাতটা বছর কাটিয়েছি মেদিনীপুর শহরে। একদিন সন্ধ্যায় যাওয়ার সময় হলনা, সাত বছরে? তারপর উত্তরবঙ্গের চাকরীর জায়গার ব্যস্ততা। ঠিকমত বললে ব্যাতিব্যস্ততা, মেদিনীপুর শহরের সাথে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। বছর ছয় সাত পর আবার মেদিনীপুরে যাতায়াত শুরু করেছিলাম। ঐসময় একদিন বাসে আসতে গিয়ে দেখলাম, শ্বশানে ঢোকার রাস্তার মুখে একটা আবক্ষ মূর্তি। সামনে থেকে ঐ মহান বিপ্লবীকে দেখিনি কোনদিন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ মূর্তির কাছে বাসটা একটু দাঁড়ানোয়, মূর্তির নিচে নাম দেখলাম, বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত !মনে একটা গোপন অপরাধ বোধ যেন উঁকি দিয়ে গেল। মনে মনেই মহান বিপ্লবীকে একটা প্রনাম করলাম।

সেই মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা অপরাধ বোধটা আবার একবার বিবেকের দরজায় নাড়া দিয়ে গেল কদিন আগে। আন্দামানে সেলুলার জেল দেখে এলাম, দু'মাস পেরিয়েছে। ওখানে প্রত্যেক ভারতীয়ের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দর্শনের অভিজ্ঞতা হল। এর মধ্যে আন্দামানের ভ্রমণকাহিনী লেখা শুরুও করেছি। গোটা ছয় পর্ব লেখাও হয়েগেল। সকালে রেডিওটা চালিয়েই শুনলাম এক বিপ্লবীর শুভ জন্মদিন। মেদিনীপুরের অত্যাচারকারী বৃটিশ মেজিস্ট্রেট পেডিকে হত্যা ইত্যাদি নিয়ে বলতে শুনেই আমার সেই গোপন ক্ষতে আঘাত খেলাম।মেদিনীপুর আমার জন্মস্থান হওয়ার সুবাদে, তিনজন অত্যাচারকারী বৃটিশ মেজিস্ট্রেট, পেডি – ডগলাস – বার্জ, এদের হত্যাকাণ্ড একটু আধটু জানাই আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের

মহান ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু আমার মত মেদিনীপুরের ইতিহাসগর্বী তথাকথিত শিক্ষিত লোকজনের যে সেই গর্ববোধের বিন্দুমাত্র অধিকার আজ আর নেই, সে তো নিজের অবস্থান থেকেই পরিস্কার।

রেডিওটা বেজেই চলেছে। আমার সেই অতিপুরাতন অপরাধবোধ আমাকে পিছিয়ে নিয়েগেল তিরিশটা বছর। এরপর যখন জানলাম, মেদিনীপুরের এই মহান বিপ্লবীকে বেশ কয়েক বছর আন্দামানের সেলুলার জেলে থাকতে হয়েছিল, নিজের অপরাধবোধটা চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছল। সেলুলার জেলের চত্তরটা এবার আন্দামানে ভ্রমণের সময় দুবার ঘুরে এলাম। সবাই তাই করে। আমরা প্রথমদিন সন্ধ্যায়ই জেলের ভেতরের লাইট এন্ড সাউন্ড দেখলাম। জেলের ইতিহাস ভূগোল সবকিছুই একটু একটু করে বলে যাওয়া হয় ঐ প্রায় ৪৫ মিনিটে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের পূণ্যভূমিতে বসে, সেই ইতিহাস শোনা,অবশ্যই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

নীল দ্বীপের কথা লেখার সময়, আমার এক শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা দিদির কথা লিখেছি। ওনার অভিজ্ঞতার কথা মাথায় ছিল। তাই বাঙালী বিপ্লবীদের কথা কতোটা বলাহয় সেটার দিকে সজাগ ছিলাম। আমার ঐ দিদি যতোটা হতাশ হয়েছিলেন, আমি ততোটা হতাশ হইনি। প্রনম্য বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর কথা বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু অন্য এক দুজনকে নিয়ে একটু যেন বেশীই মাতামাতি আছে ঐ অনুষ্ঠানে। আবার শেষের দিন, জেলখানার ভেতরের খুঁটিনাটি দেখার প্রায় শেষ পর্বে গিয়ে,

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের দীর্ঘ তালিকা দেখলাম। ঐ তালিকার সামনে দাঁড়ালে নিজেদের ক্ষুদ্রতাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করাযায়। কত অসংখ্য বিপ্লবী, কী অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেছেন, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য! এত দীর্ঘ তালিকা, সব নাম পড়ে শেষকরাই মুস্কিল।

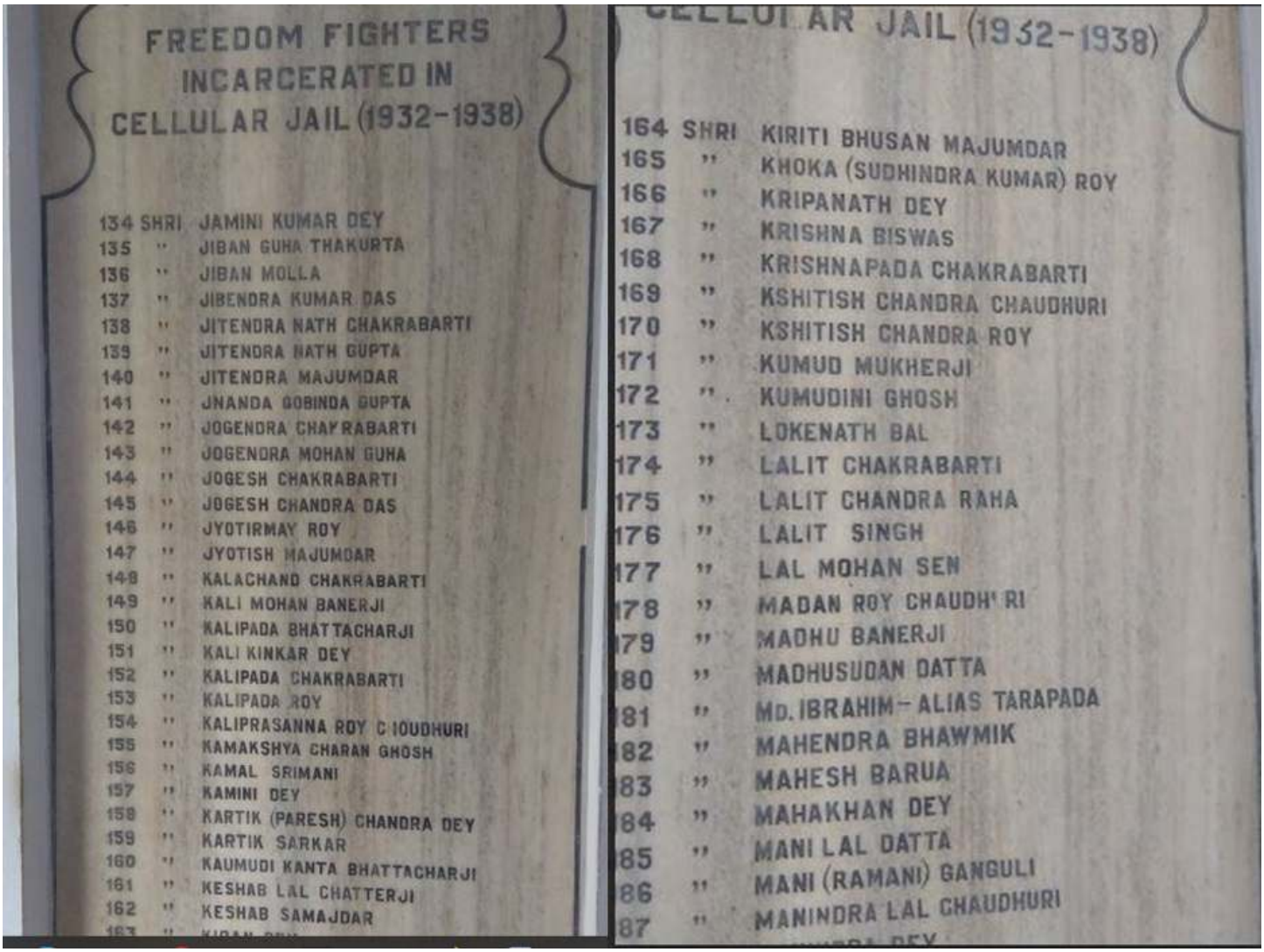

ঐ দিনটা ছিল আমাদেও আন্দামানে ভ্রমণের শেষদিন। সকালে আটটা নাগাত বেরিয়ে প্রথমে চাথামের কাঠ চেরাই কারখানা, তারপর দুটি মিউজিয়ামে ঘুরে প্রায় এগারোটা নাগাদ সেলুলার জেলে পৌছেছিলাম। মূল ফটকের ডানদিকে পঞ্চাশফুট মত দূরে ছোট একটি গেটের ভেতর টিকিট ঘর। আমাদেও চারটি টিকিট কাটার জন্য ওরা কার্ডে পেমেন্টের জন্য জোর দিল।অ ামাদেও কোন আপত্তিও ছিলনা। গাইডের দুশো টাকা, পওে গাইডকেই দিতে হল।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় যে মূল ফটক দিয়ে ঢুকেছিলাম লাইন দিয়ে, সেই ফটক দিয়েই এক দুজন করে ধিরে সুস্থে ঢুকলাম। ভেতরেই একজন গাইড দাঁড়িয়ে ছিলেন, ওনার কাছে যেতেই বললেন,

দাঁড়ান,আর দু-চারজন আসুক। ওনার কাছে আমাদেও দেখেই আর দুজন যারা ভেতরেই অপেক্ষ া করছিল, এগিয়ে এল। ততো সময়ে গাইড আমাদের, সামনেই বাঁদিকের নিরন্তর জ্বলন্ত অমর জ্যোতি দেখে নিতে বলেছেন।

মূল ফটক থেকে সোজা যে রাস্তা ভেতওে চলে যাচ্ছে তার বাঁদিকে একটা বাগানের মতজায়গায় তৈরী হয়েছে মহান শহিদের স্মরনে, অনির্বাণ শিখা।গাইডের কাছেই জেনেছি, ভারত সরকারের পেট্রলিয়াম দপ্তরের তৈরী এই অনির্বাণ শিখা, তরল প্রাকৃতিক গ্যাসে নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত। আমরা দু-একটা ছবি তুলতে না তুলতেই গাইড আমাদেও ডেকে নিলেন।

রাস্তার ডান দিকে সেই বিখ্যাত অশত্থ গাছ। লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানে যে গাছ একজন প্রধান চরিত্র। তবে, সম্ভবত বর্তমান গাছটি আদি অশত্থটি নয়। সেটি আগেই কোন ঝড়ে ভঙ্গে পড়েছে। ডান দিকে অশত্থ গাছ ছাড়িয়ে,

হাজার খানেক ধাতব চেয়ার পাতা হয়েছে, লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠান বসে দেখার জন্য। ঐ চেয়ারগুলি ছাড়িয়ে, আরও ডানদিকে চললাম, গাইডের সাথে সাথে।প্রথমেই ঢুকলাম ফাঁসি ঘরে। লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানে যে কথাটা পরিস্কার কওে বলা হয়নি, গাইড সেটা জানালেন। বিপ্লবী কাজের জন্য যাঁদেও ফাঁসি হত, তাঁদেরতো এই জেলে আনা হত না। দ্বীপান্তও সাজা প্রাপ্ত কেউ এখানে মারাত্মক কোন অপরাধ করলে, তাঁকেই এখানে ফাঁসি দেওয়া হত।

জীবনে প্রথম কোন ফাঁসির মঞ্চ, দড়ি, পাটাতনের হ্যান্ডেল, এমনকি নিচে যেখানে শহিদেও দেহ ঝুলে থাকত, সেখানে ঢুকেও দেখলাম। নিজে ডাক্তার বলেই কিনা জানিনা, প্রণম্য শহিদদেও উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসা ছাড়া আর কোন অনুভুতি হয়নি।

ওখান থেকে বেরিয়ে জেল প্রাঙ্গণের ঘানি টানার ঘর দেখতে গেলাম। সেই সময়কার ঘানি,

নারকেল ছোবড়ার থেকে দড়ি বানানোর জায়গা, পায়ে হাতে বেড়ি লাগিয়ে অত্যাচার,

এসবেরই মডেল তৈরী করে রাখা হয়েছে ঐ ছাউনির ভেতর। আমাদেও গাইড সবই বুঝিয়ে বলছিলেন। বৃটিশসাহেবরা অত্যাচারকারী ছিল, এ খবর আমরা সবাই জানি। কিন্তুআমাদেও প্রাতঃস্মরণীয় স্বাধীনত াসংগ্রামীদেও ওপর কতোটা পাশবিক অত্যাচারতারা কওে গিয়েছে, ওখানে না গেলে কোনদিন কল্পনাও করতে পারতাম না।ঐ ছাউনির বাইরে, ছাউনি আর ফাঁসি ঘরের মাঝে, একটা সিমেন্টের বেদী মত দেখিয়ে গাইড জানালেন, ওটা ফাঁসিদেওয়ার আগে শহিদ বিপ্লবীদেও স্নান করানো, আর ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনানোর জায়গা।ওখান থেকে চললাম দোতলায় বিপ্লবীদেও আটকে রাখার সেলগুলি দেখতে। আমরা অনেকেই সেলুলার জেলের একটা মডেলের ছবি অনেক জায়গায় দেখেছি। একটি সাত বাহুর একটি তারার মত। মাঝের একটা গোলমত সিঁড়িঘরের সাতদিকে সাতটি তিনতলা বাড়ী। বর্তমাতে তিনটি বাড়ী বা উয়িং আছে। বাকি চারটি বহুবছর আগেই ভূমিকম্পে নষ্ট হয়। ওগুলির জায়গায় তৈরী হয়েছে দ্বীপপুঞ্জের প্রধাণ

হাসপাতাল, জি বি পন্থ হাসপাতাল। তিনতলায় উঠলে পাখীর চোখে গোটা হাসপাতালটিই দেখা যায়।

এই যে তিনতলা এক একটি বাড়ীর মত এক একটি উয়িং; প্রতিটির এক এক তলায় গোটা তিরিশ

করে সেল বা কক্ষ সবই একই রকম। সামনে একটা টানা বারান্দা। বারান্দার দিকে দরজায় মোটা

লোহার গ্রীলের কপাট। এই গ্রীলগেট বন্ধ করার জন্য দরজার পাশে, মোটা দেওয়ালের ভেতর কৌশল

করে কব্জা লাগানোর বন্দোবস্ত। দেওয়ালের ভেতর এমনভাবেই কব্জাকে ঢোকানো যে, হাতে চাবি

পেলেও, সেলের ভেতর থেকে চাবি পর্যন্ত হাত যাওয়ার বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা নেই। সেলের পিছনদিকের দেওয়ালে,অনেক উঁচুতে ছোট্ট একটি ঘুলঘুলি; তাইদিয়ে আকাশ দেখাতো দূরের কথা, আলোও ঠিকমত ঢোকে না। প্রতিটি উয়িং এমনভাবেই তৈরী যে, কোন সেল থেকে অন্য সেলে বন্দি বিপ্লবীর মুখ দেখার কোন সম্ভাবনাই নেই। বড়জোর চিৎকার করে কথা বললে,পাশের দু তিনটি সেলের বন্দি শুনতে পাবেন।

আমরা গাইডের পিছন পিছন একটি বারান্দা ধরে, একটি একটি সেল দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম। দু একটি সেল আর কব্জার ছবিও তোলা হল। তিন তলার একেবারে শেষ সেলটি একটু বিশেষ ভাবে রাখা আছে। এইখানে, অত্যন্ত গভীর মনোবেদনার সাথে লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, আজ আমার যে কথাটা চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, সেটি বলতে পারছি না। কারন, কথাটি," পোলিটিক্যালি ইন্‌কারেক্ট"!

ঐদিন অবশ্য ঐ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমার এসব কথা মাথায় আসেনি। আমার সেই অধ্যাপিকা দিদির ক্ষোভ যে অমূলক নয়, বাঙালীমাত্রই উপলব্ধি করবেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটু আধটু যারা পড়েছে, সেলুলার জেলের লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানে গেলে, কিংবা জেলটি ঘুরে দেখলে, ইতিহাসের বিকৃত রূপ তাদের চোখে পড়বেই। আমরা গাইডের সাথে ঘুরতে ঘুরতে মাঝের গোলাকার অংশের ওপর তলায় পৌছলাম। ওখানে কয়েক মিনিট আমাদের সাথে থেকে, ওর পরে কোনদিকে যাওয়া যাবে জানিয়ে গাইড বিদায় নিলেন। ওখানে দেওয়ালে, লম্বা লম্বা মার্বেল পাথরের ফলকে, ঐ জেলে যে সকল মহান বিপ্লবীকে একসময় আটকে রাখা হয়েছিল, তাঁদের নাম ক্ষোদিত আছে। এত দীর্ঘ তালিকা যে আমরা সবকটা নাম পড়ে শেষ করতে পারলাম না। পরে শুনেছি ঐ তালিকায় ছয়শো মত বিপ্লবীর নাম আছে। তার মধ্যে পাঁচশর বেশী নাম বাঙালীর।

আমার শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা দিদির ক্ষোভ এই নিয়েই। অবশ্য আমি একটু আশাবাদী মানুষ। যে কোন দুর্যোগ, যে কোন ব্যর্থতার থেকে ভালো জিনিসটি খুঁজে বেরকরার চেষ্টায় থাকি। আজ প্রদেশ হিসেবে বাংলার এত পিছিয়ে পড়ার কারন কি? আমাদের আত্মঘাতী কাঁকড়ার স্বভাবই এর জন্য দায়ী। যেখানে অন্য প্রদেশের মানুষ নিজেদের সামান্য গৌরবের কিছু পেলেই তাকে প্রচারের কৌশলে বিশাল করে তোলেন, আমরা আমাদের যে কোন সম্পদকে কি করে ধ্বংশের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তার প্রতিযোগীতায় নেমেছি। যে নেতাজীর নাম উচ্চারণ করলে আপামর ভারতীয়ের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে, একটা কলকাতার গলির মস্তান তাঁর বাড়ীটা পর্যন্ত চেনেনা! ২০১৮ সালে , কলকাতায়

একজন কৃমিকীট , “ সুভাষদাকেই ডেকে দিন” বলার মত আস্পর্ধা দেখাল! আমরা তাকে ল্যাম্পপোষ্টে বেঁধে ঝাঁটার বাড়ী মারতে শিখিনি এখনও, এটাই সবথেকে বড় ব্যার্থতা আমাদের। আজ আমাদের এতই দুর্দশা যে, রাজ্যের বাইরে নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতেও কুন্ঠা বোধ হয় । আন্দামানের ঐ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীদের গৌরবগাঁথা শুনলে নিজেদের নীচতাকে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়।

আমরা মহান বিপ্লবীদের অনেক কটা তালিকা থেকে কয়েকটার ছবিও তুললাম। আমার একটি মাত্র পরিচিত নাম চোখে পড়ল, চট্টগ্রামের প্রাতঃ স্মরণীয় মাষ্টারদার সহযোদ্ধা , প্রনম্য লোকনাথ বল।

এই মাত্র সেদিন, ২৯ শে এপ্রিল, সকালে রেডিও শুনে জানলাম, প্রণম্য বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত মহাশয়ও ঐ পবিত্র কারগারে কয়েক বছর থেকে এসেছেন। একথা শুনেই আমার স্ত্রী জানাল, সেলুলার জেলের ঐ মার্বেল ফলকগুলির কোনটিতে, সে ঐ মহান বিপ্লবীর নামটি দেখেছে।আমার অপরাধবোধের কলসটি এবার কানায় কানায় পূর্ণ হল। এরপর থেকে," মেদিনীপুরে আমার জন্মভিটা", একথাটা বলার আগে, নিজের অজ্ঞতা আর তুচ্ছ কারনে ঐ মহান বিপ্লবীর চরণ স্পর্শ করার সুযোগ হারানোর আপশোস, আজীবন আমাকে তাড়াকরে বেড়াবে।

আন্দামানের বৃহত্তম কাঠকল

আন্দামান ভ্রমণের ভ্রমনসূচি ইত্যাদি নিয়ে প্রথম পর্বেই অনেকটা লিখেছি। আন্দামানে প্রধানত সুন্দর সুন্দর সমুদ্রতট আর সবুজের সমারোহ দেখতে যায় সবাই। আমার ছেলে মেয়েও ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে, গোটাছয়েক ট্যুর কোম্পানির নানান কিসিমের প্যাকেজ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে একটা ছয় রাত সাত দিনের ভ্রমনসূচি তৈরী করেছিল। মূলত মাসচারেক আগে এরোপ্লেনের টিকিট কাটলে একটু দাম কমপড়ে,এই পর্যবেক্ষণ করেই, ঐ রকম প্রায় একশ আঠারো দিন আগে টিকিট কাটা হয়েছিল। এরপর অনেকটা ঐ ভ্রমনসংস্থার দেওয়া খরচের হিসেবেই, ওদের দেওয়া একটা ভ্রমনসূচি চুড়ান্ত করা হল। আন্দামানে সমূদ্রতট ছাড়া ঐতিহাসিক সেলুলার জেল সব ভ্রমনসূচিতেই থাকে। এছাড়া "জারোয়া দর্শনের" মত চুড়ান্ত অমানবিক আর প্রায় অশ্লীল একটা যাত্রাপথ প্রায় সকলেই রাখে। এ ব্যাপারে আগেই বোধহয় একটু উল্লেখ করেছি। যাই হোক, সময়ের অভাব বা যেকোন কারনেই হোক, আমাদের ভ্রমনসূচিতে ঐ আপত্তিকর ব্যাপারটি ছিল না; তাই আঙুর ফল টকই হোক আর মিষ্টিই হোক, আমার মনে কোন আফশোষ নেই। কিন্তু পোর্টব্লেয়ার শহরের ভেতর সেলুলার জেল ছাড়াও যে আর একটা ঐতিহাসিক দর্শণীয় জায়গা আছে, আমরা রওনা হওয়ার আগেরদিনই জেনেছি। সেনবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাই, উনি না বললে, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা না দেখেই হয়তো চলে আসতাম।

রওনা দেওয়ার আগের সন্ধ্যায় সেনবাবুকে একটা চাবি দিতে গেছলাম। উনি কয়েকবছর আন্দামানে চাকরী করেছেন, বছর চারেক আগে এদিকে ফিরে এসেছেন। আন্দামানের এটা ওটা গল্প করতে করতে বললেন, চাথামের কাঠ চেরাই কারখানাটা দেখে আসবেন, এশিয়ার বৃহত্তম কাঠকল। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম,আমাদের ভ্রমনসূচিতে আছে কি না। ও জানাল, ওটার কথা ওরা ভাবেনি। তবে শেষদিন তো শহরের মিউজিয়ামগুলি দেখার কথা, ঐদিন দেখে নেওয়া যাবে।

সাধারণত আন্দামান ভ্রমণের সফরসুচিতে একটা দিন পোর্টব্লেয়ার শহর দেখার জন্য রাখা থাকে। সকলেই সেলুলার জেলের লাইট এন্ড সাউন্ড দেখে একদিন সন্ধ্যায়। আমরাও প্রথমদিন সন্ধ্যায়ই ওটা দেখেছি। আমাদের প্লেন দেরীকরে যাওয়ায় প্রথমদিনই জেলের ভেতরটা ঘুরে দেখা হয়নি। প্রথমদিনই এটা দেখা উচিত ছিল, পরে বুঝেছি। জেলের ভেতর যে ছোট্ট মিউজিয়াম আছে, সেটা দেখেনিলে,বিশেষ করে রস দ্বীপের ইতিহাস আগে জেনে ওখানে বেড়াতে গেলেই ভালো।

আমদের যেহেতু একেবারে শেষদিন শহর ঘোরার পরিকল্পনা ছিল, প্রথমদিন জেলখানা না দেখায় কোন আপত্তি হয়নি। শেষের আগেরদিনই যখন চিড়িয়াটাপু থেকে ফিরছিলাম, গাড়ীর ড্রাইভারের সাথে কথা বলেনিয়েছিলাম, শেষদিন জেল ছাড়াও আরও তিনটি জায়গা দেখে নেব। এগুলি ওদের নির্দিষ্ট সফরসুচিতে ছিল না, তাই প্রতিটি পয়েন্টের জন্য পাঁচশ টাকা করে অতিরিক্ত দেড় হাজার টাকা লাগবে।

সকাল আটটায় হোটেল থেকে চেক আউট করে বেরিয়েপড়লাম। ব্যাগপত্র সব গাড়ীতে নিয়ে ঘুরতে বিশেষ কোন অসুবিধাও হল না। হোটেল থেকে শহরের আরেক প্রান্তে চাথাম কাঠকলে যেতে আধ ঘন্টার মত লাগল। ঐদিন শহরের ভেতরদিয়ে ম্যারাথন দৌড় চলছিল। কিন্তু তারজন্য কোথাও আমাদের গাড়ীকে এক মিনিটও দাঁড়াতে হয়নি। একটা ব্রীজের ওপরদিয়ে গাড়ী গিয়ে একেবারে কাঠকলের দরজায় আমাদের নামাল। ঐযে বললাম, ব্রীজের ওপরদিয়ে গাড়ী গেল; এটা পরে বুঝেছি, ভেতরের মিউজিয়ামে একটা মানচিত্র দেখে। চাথাম আসলে একটা আলাদা দ্বীপ। গেটের বাইরের টিকিটঘর থেকে মাথাপিছু কুড়িটাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম।

টিকিট ঘরেই জানতে চাইলে,ওরা বলল, ভেতরে ঢুকে বাঁদিকে দেখুন, ওরা বসে আছে, পঞ্চাশ টাকা নেবে। বাঁদিকে একটা খোলা বসার ঘর মত দেখাগেল ; জন তিনেক প্যান্ট শার্ট পরা লোক বসেছিল, একই রকম পোশাক। দেখে গাইডের মতই লাগল। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় খুব মগ্ন ছিল। কোনরকমে বলল, এগিয়ে যান, গাইড ওদিকেই পাবেন। অগত্যা পঞ্চাশ ষাট গজ এগিয়েই গেলাম।

ডান দিকে প্রচুর চেরাই করা কাঠ থরে থরে সাজানো দেখলাম। যে পিচ বাঁচানো রাস্তাটা ধরে এগোচ্ছিলাম, তার একপাশ ধরে টয় ট্রেনের লাইন পাতা দেখলাম। বাঁদিকে একটা দোকানে কাঠের নানান পুতুল, মাছ, পাখি ইত্যাদি সাজানো আছে, কাঁচের ভেতরদিয়ে দেখাযাচ্ছে। তারপরই একটি মিউজিয়াম। দরজা ঠেলে একটি বড় এয়ারকন্ডিসন্ড হলের ভেতর ঢুকলাম। একজন মহিলা কর্মচারি বসেছিলেন। ওনাকে গাইডের কথা জানতে চাওয়ায়,উনিও গেটের কাছের ঘরটিতে খোঁজ নিতে বললেন। ভেতরে প্রচুর কাঠের প্রদর্শন সামগ্রি ছাড়াও,নানান মডেল আর মানচিত্র ইত্যাদি সব নিজেরাই দেখলাম। সব কিছুর জন্যই ইংরেজী আর হিন্দীতে বোর্ড দেওয়া আছে,বুঝতে কোন অসুবিধাও হল না। অনেক ছবিও তোলা হল।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আমি আর ছেলে আবার গেটের কাছে গাইডদের কাছে গেলাম। এবার একজন আমাদের সাথে চলল। মিউজিয়াম দেখা হয়েগেছে বলায়, ঐ বাড়ীর পাশদিয়ে একটা গলির মত রাস্তাদিয়ে চলতে শুরু করল। চলতে চলতেই এই কাঠচেরাই কারখানার ইতিহাস বলতে থাকল। ঐ গলির মুখে একটু বিবর্ণ একটা সাইনবোর্ড দেখলাম;

তাতে দিকচিহ্ন দেওয়া আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমের জায়গা। আমাদের দলের সাথে দেখা হল দুজন গেষ্টের,ওরা স্বামী স্ত্রী , গাইড ছাড়াই ঘুরছিল। আমাদের গাইডকে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখার আছে। গাইড পাশের মিউজিয়ামের দরজা দেখাল আঙ্গুল তুলে, আর ঐ সাইনবোর্ড দেখিয়ে বলল, এরকমের বোর্ড আছে, দেখে দেখে এগিয়ে যান। আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, কোন ভ্রমণস্থানেই গাইড ছাড়া ঘোরা উচিত নয়। আশি ভাগ জিনিসই অজানা থেকে যায়।

ঐ গলিরাস্তা ধরে পঞ্চাশ ষাট গজ এগিয়ে গেলাম। একটু উঁচু পুকুর পাড় মত জায়গায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠলাম। বাম দিকে একটা বড় সেগুন গাছ দেখিয়ে গাইড জানাল, ওটা টিক গাছ। সেগুনকে টিক বলে সে তো জানি। কিন্তু আন্দামানে প্যাডক (Padauk) নামে যে এক মহার্ঘ গাছ আছে,তার খবর ঐ প্রথম শুনলাম। গাইড জানাল, এই প্যাডকের জন্যই সাহেবরা এরকম একটা প্রত্যন্ত দ্বীপপুঞ্জের ভেতর এমন একটা কাঠ চেরাই কারখানা তৈরী করেছিল। গাইডের মতে, প্যাডকের কাঠের দাম টিক বা মেহগিনী কাঠের অন্তত চার পাঁচগুন বেশী। আমি কাঠ বিশেষজ্ঞ নই, সেগুন একটা দামী কাঠ,এটুকুই আমার জানার দৌড়। ছবিতে যে প্যাডকের গাছ দেখলাম, আন্দামানে ভ্রমণের সময় ঐ গাছ দেখলেও, পরে আর চিনব না।

ঐযে একটা পুকুর পাড়ের মত জায়গা বললাম, ওটার ভেতরে তাকিয়ে দেখি একটা শুকনো ডোবা। নিচে সামান্য কটা শুকনো পাতা পড়ে আছে, আসপাশের গাছ থেকে। একটা পরিত্যক্ত ঝোলানো সেতু মত টাঙানো আছে, আগে হয়তো এপাড় থেকে ওপাড়ে যাওয়া যেত। ডোবাটা কুড়ি ফুট মত গভীর আর পঞ্চাশ ফুট মত ব্যাসের হবে। গাইড জানাল এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা বোম পড়েছিল, তাতেই এমন গর্ত হয়েছে। বোমার রাসায়নিক এতই ভয়ংকর ছিল যে, আজ পঁচাত্তর বছর পরেও ডোবার মাটিতে ঘাস জন্মায় না। ঐ বিশ্বযুদ্ধের কিছু কিছু বোমারু বিমানের বোম ফেলার ভি ডি ও দু একটা দেখেছি, ইন্টারনেট এর কল্যানে। কিন্তু বোম পড়ে কতোটা ধ্বংশ করতে পারে, আগে কোনদিন দেখিনি।

ওখান থেকে ফেরার সময় গাইড বলেছিল, এরকমের তিনটি বোম পড়েছিল সে সময়, এই চাথাম কাঠ কলের ওপর। তাতে কারখানার অর্ধেকের বেশী ধ্বংশ হয়ে যায়। পরে আবার অনেকটাই নতুন করে তৈরী হয়েছে।

মিউজিয়াম পেরিয়ে বাঁদিকে এগোলাম। একটু এগিয়েই বাঁদিকে একটা ছোট্ট টিলা মত চোখে পড়ল। টিলার মাঝ বরাবর উঠে, গাইড একটা বাঁধানো সুড়ঙ্গ পথ দেখাল। এখন বাইরেটা একটু দর্শণীয় করে, চকচকে স্টিলের বেড়া মত দেওয়া হয়েছে। গাইড জানাল ওটা জাপানী সেনার একটা বাঙ্কার ছিল। ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে বলল। আমরা সবাই বাঙ্কারে ঢুকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফুট চলে গেলাম; তারপর রাস্তা বন্ধ। ফেরার পর মূল কারখানার দিকে এগোলাম। ভারতের বহু ভ্রমনস্থানেই তো ঘুরলাম। পুরনো দূর্গ আর বিশ্বযুদ্ধের পরিত্যক্ত রানওয়ে দেখলেও, এমন বাঙ্কারে ঢুকে দেখার সুযোগ কোথাও হয়নি।

হাটতে হাটতেই গাইড আমাদের অনেক তথ্য জানাচ্ছিল। বাঙ্কার থেকে নেমে বাঁদিকে কয়েক পা হেঁটেই ডানদিকে মূল কারখানার দিকে চললাম। একটা প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু আসবেসটসের ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে, ডানদিক বাঁদিকে সব দাখলাম। ঐ প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু মোটা কাঠের থাম দেখিয়ে গাইড জানাল, ওগুলি প্রথম থেকেই আছে, প্যাডক কাঠের। আজকাল ওরকম উঁচু থাম, ষ্টিলের বা কংক্রীটেরই হয়। কয়েকধাপ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার মূল কারখানা।

সব জায়গায় বোর্ডে লিখে দিকচিহ্ন দেওয়া আছে, কোনদিকে যাওয়া যাবে আর কোনদিকে নয়। শক্তপোক্ত কাঠের মেঝে। দোতলায় ওঠার আগে থেকেই একটানা যান্ত্রিক করাত চলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দোতলায় উঠে, প্রথমে বাম দিকে কয়েক পা এগোলেই, কারখানার পিছনের সমূদ্রের খাঁড়ি দেখাগেল। গাইড দেখাল, খাঁড়ির জলে বিশাল বিশাল গাছের গুঁড়ি ভাসছে। ওটাকেই বোধহয় সিজনিং বলে। গাইডের মতে, গাছের গায়ে যে ছোট ছোট পোকা মাকড় থাকে, সমূদ্রের জলে কয়েকদিন ডুবলে সেগুলি মরে যায়, মাছেও কিছু পোকাকে খেয়ে ফেলে।

জলে সিজনিং করা বিশালকায় সব কাঠের গুঁড়ি ক্রেনে করে তুলে, আস্তে আস্তে করাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বামদিকের বড় করাতের কাছে যাওয়ার সুযোগও নেই, কাছে গিয়ে দেখার সাহসও ছিল না। গোটা চত্তরে একটা কাঠের গুঁড়োর গন্ধ ম ম করছে। একটু গুঁড়ো উড়ছেও। আমরা পাঁচজন যে দাঁড়িয়ে দেখছি বা আমার ছেলে যে মোবাইল ক্যামেরায় ভি ডি ও তুলছে, তাতে যে কয়েকজন নিরবে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই দেখলাম। দোতলায় এতবড় কারখানায় সবমিলিয়ে জনা চারেক লোক কাজ করছেন। প্রায় সব কাজই মেশিনে হচ্ছে। বাঁদিকের প্রথম করাত থেকে কাঠ চেরাই হয়ে একটা কোমর সমান উঁচু কাঠের পাটাতনের ওপরদিয়ে যেন ভেসে ভেসে ডানদিকে চলে যাচ্ছে। সবই লাগাতার ঘুরতে থাকা কতগুলি পুলির ওপরদিয়ে।

ডানদিকে কিছুটা যাওয়ার পর আবার দিক পরিবর্তন করে আর একটা রাস্তা ধরছে। এসব সময় কুড়ি পঁচিশ ফুট লম্বা ঐ তক্তা একটু আধটু তেরছা হয়েগেলে, হাতে দেড় দু ফুটের মত লম্বা লোহার হুক নিয়ে টেনে সোজা করে দিচ্ছেন, একজন বা কখনও দুজন শ্রমিক। ওদিকে কিছুটা গিয়ে আবার নতুন দিক ধরছে ঐ চলমান তক্তা। ওদিকে যে চকচকে ঘুর্ণমান করাতে ঐ তক্তা আবার একটু চেরাই হচ্ছে, সেটা দেখাই যাচ্ছে। ঐ তক্তা শেষে ঐভাবে পাটাতন বেয়ে, প্রায় ভাসতে ভাসতেই দূরে চলে যাচ্ছে। দূরে কোথায়..... সে তো দেখতে পাচ্ছি না।

গাইড বলছিল, " লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের সব কাঠের আসবাব এই আন্দামান থেকে নেওয়া প্যাডক কাঠের তৈরী।" দোতলায় একটা বড় পুরনো মেসিন দেখিয়ে গাইড বলেছিল, ওটা পুরনো স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে চালানো করাত কল। নতুন বৈদ্যুতিক মেসিন এসে ওকে মিউজিয়ামের প্রত্নসামগ্রী বানিয়েছে। কারখানা থেকে বেরনোর রাস্তাটা ঐ চকচকে ঘুর্ণমান করাতের পাশদিয়েই। নিচে নেমে গাইড আমাদের কাছে তার মাত্র পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে বিদায় নিল। ভারতবর্ষে আর কোথাও এত কম টাকায় গাইড আছে কিনা আমি জানিনা। এই এক ঘন্টা মত সময়ে ও আমাদের যা কিছু দেখাল বা জানাল, পঞ্চাশ টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও তার জন্য যথেষ্ট নয়। আমরাই তো তার পাঁচ দশ মিনিট পরই কারখানার দোকান থেকে দুটি প্যাডক কাঠের ডলফিন কিনলাম।

আমি জানি, ঐ ছ ইন্চি মাপের ডলফিন দুটি আটশো টাকা দিয়ে কিনলাম বটে, আট মাস পরই ওরা বাড়ীতে জমতে থাকা নানান স্মৃতিচিহ্ন আর উপহারের ভীড়ে, হয়তো বছরে একবার নেড়ে দেখার মত মনোযোগও পাবে না। কিন্তু এই একটা কাঠকল, এমন হাজার হাজার কাঠকল হয়তো এদেশে ছড়িয়ে আছে, এর বুকে একটা ইতিহাসকেই আগলে নিয়ে পোর্টব্লেয়ারের এক প্রান্তে আজও জীবন্ত ইতিহাস হয়ে বেঁচে আছে। কজন জানে এর কথা?

আর ঐ মহার্ঘতম প্যাডকের তক্তাগুলি? ওদের চোখের সামনে, কারখানার পাটাতনের ওপরদিয়ে ভেসে যাচ্ছে, মনেহল কেন আমার? বাইরে এসে দেখলাম, অত্যাধুনিক চলমান ক্রেনে করে চেরাই কাঠ পরিবহনের ব্যবস্থা। ঐ যে টয় ট্রেনের লাইন মত পাতা দেখেছি, তার ওপরদিয়ে কাঠের বোঝা নিয়ে বেরিয়ে আসছে ছোট ছোট ট্রলি। ঐ সব কাঠই তো জাহাজে চেপে ভেসে যাবে দূর দূর বন্দরে।

একদিন এই প্রত্যন্ত দ্বীপপুঞ্জের, আরও দূর্গম কোন দ্বীপের মহার্ঘ প্যাডক গাছ, এই চাথামের কাঠ চেরাই কলে তক্তায় পরিনত হয়েছে। তারপর জাহাজে ভেসে ভেসে, মহাসাগর, মহাদেশ পেরিরে পৌছেগেছে ভারতভাগ্যবিধাতার সুরম্য অট্টালিকার শোভা বর্ধন করার জন্য। আজও কি এ দেশের মহার্ঘ জিনিসগুলি ভেসে যাচ্ছে না, রাজার দেশে? যাচ্ছে, যায়, প্রতিনিয়তই চলে যাচ্ছে আমার দেশের কোহিনুর মণীর মত মহার্ঘতম বুদ্ধিমান মানুষগুলি। ক্যালিফোর্নিয়া শহরে বসবাসকারী, আই আই টির উজ্জ্বলতম প্রাক্তনিটি মেদিনীপুরের কোন এঁদো গ্রাম থেকে একদিন ভেসে গিয়েছেন, আমরা কি কেউ তার খবর রাখি?

আন্দামান ভ্রমণ (৯)- রস আর নর্থবে দ্বীপ

আন্দামানের সেলুলার জেলের ভেতর একটি ছোট প্রদর্শনশালা বা মিউজিয়াম আছে। গাইড আমাদের কাছথেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলেদিয়েছিলেন, ছাদে গিয়ে ছবি তুলতে পারেন, আর নিচের প্রাঙ্গণের মিউজিয়ামে ঘুরে যাবেন।

এখন যে তিনটি উয়িং অবশিষ্ট আছে, তার একেবারে পিছনেরটির ছাদেই ওঠাযায়। আমরা যখন ঐ ছাদে উঠি, তখন সূর্য একেবারে মধ্য গগনে। রোদের ভেতর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি হেঁটে, ছাদের একেবারে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম।

ছাদের উপর থেকে দূরে রস আর নর্থবে দ্বীপ দুটি দেখা যাচ্ছে। রস তো এতোই কাছে, মনেহয় লোকজনকে হাঁটতেও দেখা যাচ্ছে। আমরা আন্দামানে পৌছনোর পরদিনই ঐ দুই দ্বীপে ঘুরে এসেছি। রসদ্বীপে বেশকিছু পোড়োবাড়ী মত দেখেছি। ওগুলির সম্বন্ধে কিছুই জানা হয়নি।

সেলুলার জেলের ছাদ থেকে নিচে নেমে এলাম। আমাদের এবারের আন্দামান ভ্রমণের শেষ দর্শনীয় জিনিস, সেলুলার জেলের চত্তরের ছোট মিউজিয়ামটিতে ঢুকলাম। একটি বড় হলঘরে যত্নকরে রাখা অনেক ছবি। আমরা গত ছ দিনে যেসব দ্বীপে ঘুরেছি, সেরকম কিছু জায়গার ছবি যেমন আছে, আমাদের দেখা হয়নি তেমন জায়গার ছবিও আছে।

যে রসদ্বীপে আমরা কদিন আগে ঘুরে এলাম, তার ইতিহাসকেই ছবিতে দেখলাম। এই একটি জায়গায় এসেই মনেহল, প্রথম দিনই জেলের ভেতরের এই মিউজিয়ামটিতে ঢুকলে ভালো হত। আমরা এবার যে ভ্রমণসংস্থার ব্যবস্থাপনায় এসেছিলাম, তাদের সূচী অর্থাৎ ইটিরেনারী অনুযায়ী, প্রথমদিনই বিকেলে আমাদের সেলুলার জেল দেখার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে প্লেন ছাড়ার আগের মূহুর্তে একজন যাত্রি অসুস্থ হওয়ায়, এক ঘন্টা দেরী হল রওনা দিতে আর পৌছতে। তাই প্রথমদিন আর জেল দেখতে যাওয়া হয়নি। প্রথমদিন আমরা কোভরিং কোভ বীচ আর জেলের লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠান দেখতে পেরেছিলাম। বিকেলে গাড়ীতে কোভরিং কোভ বীচের দিকে যাওয়ার সময় একটা জায়গা থেকে রসদ্বীপ দেখিয়ে ড্রাইভার বলেছিল, আগামীকাল আপনারা ওখানে যাবেন। পরে রাজীব গান্ধী ওয়াটার স্পোর্টস কম্প্লেক্সের ভেতর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটা ডিঙি নৌকা নিয়েই রসে চলে যাওয়া যাবে।

পরদিন সকালে ভ্রমণ সংস্থার গাড়ী এসে আমাদের হোটেল থেকে জংলীঘাট জেটিতে নিয়েগেল। আমাদের হোটেল থেকেই, পিছনদিকে জংলীঘাট জেটি দেখাযায়, পরে দেখেছি। জংলীঘাটে গিয়ে দেখি গাড়ী আর ট্যুরিস্টের মেলা বসেছে যেন। আমাদের জন্য ঠিক করাই ছিল, মার্ক মেরিনা লঞ্চ। ভ্রমণ সংস্থার লোক এসে আমাদের লঞ্চের টিকিট দিয়ে গেল। আগেও বলেছি, এই একটি জায়গায় দেখলাম, বেশকিছু লোক নানান রকমের জলক্রীড়ার টিকিট বিক্রীর জন্য, লোকজনকে প্রায় বিরক্ত করছে। এমনকি সাথে টাকা কম থাকলে, পরে হোটেল থেকেও নিতে পারে, এমন প্রস্তাব সকলকেই দিচ্ছে। আমরা চারজনের জন্য বেশ দাম দিয়েই, সেমি সাবমেরিনের টিকিট কিনলাম। মুখে মুখেই ডেকে, আমাদের মার্ক মেরিনা লঞ্চের জন্য জেটিতে লাইন করে দাঁড়াতে বলল। প্রায় একশো জন মত যাত্রি উঠলাম। লঞ্চের আকার আমাদের, হাওড়া বাবুঘাট ফেরীতে চলা লঞ্চের মত। তবে বসার আসন বেশ গদি দেওয়া। আর বৃষ্টি বাদলার থেকে বাঁচার জন্য সুন্দর কাঁচে ঘেরা। সবাই উঠে যেতেই, একজন কর্মচারি সকলকে, লাইফ জ্যাকেট বেঁধে নিতে বলল।

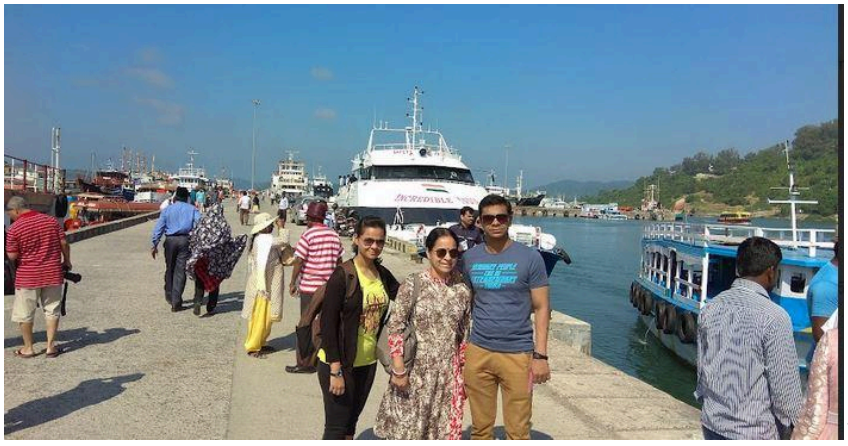
জংলি ঘাট

এই প্রথম লাইফ জ্যাকেট বেঁধে কোন জলযানে বসা। বেশ একটা উত্তেজক ব্যাপার। তার ওপর আন্দামান ভ্রমণ মানেই বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরে বেড়ানো। বেশ জাহাজে লঞ্চে ঘুরে বেড়ানো হবে, এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই

ছিলাম। যাত্রিদের বেশীরভাগই বাংলায় কথা বলছে দেখলাম। লঞ্চ মিনিট দশেক চলার পরই দেখি, এক দাদু উঠে দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট ডিজিট্যাল ক্যামেরায় ছবি তুলছেন। ছবি আমরাও প্রায় সকলেই তুলছি, ক্যামেরা, নয়তো মোবাইলে। আসলে, বিশেষ করে বাঁদিকের দৃশ্য এতোই নয়নাভীরাম যে, ছবি না তুলে থাকা যায় না। আচ্ছা, দাদু কি একটু দুলে দুলে নাচছেন না কি? প্রথমে মনে হয়েছে, দাদুর বেশ ছোটখাটো চেহারা; তার উপর ঐ উজ্জ্বল লাইফ জ্যাকেট বেঁধে বেশ পুতুল পুতুল লাগছে। তাই লঞ্চের দুলকি চালে মনে হচ্ছিল, নাচছেন। একটু পরেই দেখি, জ্যাকেট বাঁধা দিদিমাটি উঠে দাঁড়িয়ে, দেশ দুলে দুলে নাচছেন।

মিনিট পঞ্চাশ চলার পর, লঞ্চ পৌছল রস দ্বীপের ঘাটে। হ্যা, ঘাটই; বেশ সুন্দর করে বাঁধানো ঘাটের পরই, টিকিট ঘর। দ্বীপে ঢোকার জন্য মাথাপিছু তিরিশ টাকার টিকিট। আমরা টিকিট কেটে দ্বীপে ঢুকলাম। লঞ্চের কর্মচারি নামার সময় বলেদিল, এক ঘন্টা পরেই ফিরে আসতে হবে।

রস দ্বীপে

দ্বীপে ঢোকার পরই অনেকটা খোলা মাঠ মত। বাঁধানো রাস্তা ডানদিক বাঁদিকে চলে গেছে। রাস্তার পাশে পাশে লম্বা লম্বা নারকেল গাছ। আমরা বাঁদিকে এগিয়ে গেলাম। আবার একটু বাঁদিকে এগিয়ে, সমূদ্রের বাঁধানো পাড় পেলাম। পাথরের ওপর এসে পড়ছে সমূদ্রের ঢেউ। এত টলটলে পরিস্কার জলও যে হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করাই মুস্কিল। সমূদ্র পিছনে রেখে দু একটা ছবি তোলা হল। তারপর পাড় ধরে এগিয়ে গেলাম দ্বীপের উত্তর পশ্চিম কোনের দিকে। ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরের নর্থ বে দ্বীপকে নীল সমূদ্রের জলে ভেসে থাকা একটা সবুজ অরন্য মনে হল।

ঐ কোনের দিকে একটা ছোট্ট হেলিপ্যাড আছে। এমনিতে কোন প্রাচীর বা গেট নেই; কিন্তু একটা ছোট্ট বোর্ডে লেখা আছে " এন্ট্রি রেস্টিকটেড"! দু একজন গেষ্ট দেখলাম, ঐ হেলিপ্যাডের ওপর দিয়েই, অলস ভঙ্গিমায় হেঁটে যাচ্ছে। বারন করারও কেউ নেই। আমরা ওদিকে না গিয়ে, ডানদিকে,দ্বীপের ভেতরদিকে এগিয়ে গেলাম। ওখানে ফাঁকা মাঠের ভেতর অনেক ধাতব চেয়ার পাতা আছে দেখলাম। ওখানে সন্ধ্যায় লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠান হয়, বোঝাগেল। আবার উত্তর দিকে এগোলে কয়েকটা পোড়ো বাড়ীর ধ্বংশাবশেষ দেখাগেল। একসময়

বাড়ী ছিল, এখন ভাঙা দেওয়ালে ইঁটের থেকেও গাছের শেকড়ই বেশী চোখে পড়ে। অবস্থা দেখলে তো মনেহয়, কয়েকশ বছর আগে ওখানে মানুষ থাকত। কিন্তু আন্দামানের ইতিহাস কি এত পুরনো? জানি না; লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠান দেখলে হয়তো জানা যেত।

কিন্তু ঐ পোড়ো বাড়ীগুলি পেরিয়ে গেলে, একটা প্রায় ব্যবহার যোগ্য সুইমিং পুল দেখলে একটু অবাকই হতে হয়। সমুদ্রের বাঁধানো পাড়ের তলাদিয়ে ঐ পুলের জলের সাথে যুক্ত পাইপ লাইন আছে দেখাযাচ্ছে। এবার আমরা হাঁটতে হাঁটতে পুব দিকে এগোলাম। একটা ঐরকম পোড়ো বাড়ীর ভেতর একটা ভাঙাচোরা বয়লার দেখলাম। ওখানে বোর্ডে লেখা থেকে জানলাম , ওটা পানীয় জল তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হত।

রাস্তাটা ক্রমশ উপরে উঠছে। যতোই ওঠাযায়, দুপাশের গাছপালা ততোই ঘন হতে হতে একেবারে জঙ্গলের মত হয়েছে। অনেক নারকেল গাছ। এছাড়া তাল গাছের মত ছোট বড় মাঝারি নানান ধরনের গাছের ছায়ায় কয়েকটা ময়ুর দেখা গেল। ঐ ছায়ায় ঢাকা গাছের তলায় একজন দেহাতি মতন মানুষ বস্তা ভরে নারকেল সংগ্রহ করছে দেখলাম।

বাঁধানো রাস্তা ক্রমশ পাহাড়ের উপরে উঠছে। এক জায়গায় গিয়ে দেখি, তিন রাস্তার মোড়। কোনদিকে গেলে কি দেখার আছে কিছুই জানিনা। বাঁদিকের ছায়া ঢাকা রাস্তা ধরে দুচারজন নেমে আসছে দেখে, ওদিকেই এগোলাম। পঞ্চাশ ষাট গজ এগিয়ে ডানদিকে কয়েকটা বড় বাড়ী দেখলাম। ভেঙে না পড়লেও, মানুষজন থাকেনা,দেখলেই বোঝাযায়। কোন গাইড না থাকায় কিসের বাড়ী,কে থাকত, কিছুই বুঝলাম না। বাড়ীগুলীর গঠনশৈলী পুরনো ইউরোপীয় ধাঁচের।

পরে সেলুলার জেলের ভেতর মিউজিয়ামে ছবি দেখে জেনেছি যে, এক সময় ঐগুলিই ছিল, বলাযায় দ্বীপপুঞ্জের রাজ বাড়ী। ঐসব পোড়োবাড়ীই ছিল, দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর।

আমরা ডানদিকে, গাছের শেকড়ে ঢাকা পুরনো দেওয়ালগুলিকে রেখে, এগিয়ে চললাম। বাঁদিকে গভীর খাদ; কিন্তু ঘন গাছপালায় ঢাকা থাকায়, পাহাড়ী খাদের মত লাগে না। মাঝে মাঝে গাছের ফাঁক দিয়ে অনেক নিচে ঘন নীল সমূদ্রের জল দেখা যাচ্ছে, সবুজের ভেতরদিয়ে এমন ঘন নীল আর কোথাও দেখিনি। ঐ রাস্তার শেষে, একটা ছোট্ট মাঠ মত জায়গা। ওখানে একটু নিচু লোহার বেড়া দিয়ে একটা বিশাল নোঙর-এর আকৃতির ভাস্কর্য রাখা আছে। হয়তো নৌ সেনার কোন কীর্তির স্মারক হবে। একটু ডানদিকে তাকালে, গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে অকুল সাগর দেখা যায়। ওদিকে কোন দ্বীপের কোন আভাসও চোখে পড়েনা। এক দুটি ছবি তুলে ফেরার রাস্তা ধরলাম। আবার সেই তিন রাস্তার মোড়ে এসে, সোজাই চলতে থাকলাম। ওখানে একটা ছোট্ট সমতল জায়গায় একটা বড়, শিংওয়ালা হরিণ ঘুরছিল। ওকে একটি গেষ্ট মেয়ে বিস্কুট খেতে দিল। তাই দেখে ওখানে কর্মরত ঝাড়ুদার একটু ধমক দিল। বিস্কুট না দিয়ে পাতা ছিঁড়ে দিতে বলল।

ওদিকে একটা পুকুর আছে, এরকম একটা দিক নির্দেশ দেখতে পেলাম। গাছপালার ছায়ার ভেতরদিয়ে হেঁটে কিছুটা এগিয়ে, ডানদিকের নামার রাস্তা ধরলাম। ডানপাশে একটা ডোবা মত দেখাগেল। বাঁধানো রাস্তার পাশে

দু একটা বসার মত জায়গা আছে। বয়স্করা সম্ভবত উপরে না উঠে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটি বড় শিংওয়ালা হরিণ এসে এক বয়স্ক মহিলার হাত থেকে বিস্কুট খেল। আরও নিচে নেমে,প্রায় ঘাটের কাছে, কয়েকটা খরগোসও ঘুরছে দেখলাম। কয়েকজন গেষ্ট ওদের কিছু খেতে দিলে,কাছে এসে খেয়ে গেল। আমাদের ফেরার জন্য যে সময় বলেদিয়েছিল, মিনিট দশেক বাকি আছে দেখে, আমরা ডাব কিনে খেলাম। দাম কলকাতার মতোই। ঘাট থেকে মার্কমেরীনা লঞ্চের কর্মচারি ডাকদিলে,সবাই লঞ্চে উঠেগেলাম।

আবার সেই লাইফ জ্যাকেট বেঁধে বসে গেলাম। আধ ঘন্টা মত চলে,আমরা নর্থবে দ্বীপের ঘাটে পৌছলাম। ওখানে একটা ভাসমান জেটিতে নেমে, ভাসানো রাস্তা দিয়ে পাড়ে এলাম। এখানে পাড়েও বড় বড় পাথর ছড়ানো। বয়স্করা এসব জায়গায় নেমে পাড়ে উঠতে বেশ সমস্যায় পড়বেন।

নর্থ বে

পাড়ে বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানপাট। ওর ভেতরই যাদের ওয়াটার আক্টভিটির টিকিট আছে, তাদের জন্য চালার ভেতর লোকজন, সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে।

পাড়ের থেকে অল্প দূরেই, নানা রকম জলক্রীড়ার ব্যবস্থা। স্নরকেলিং, স্কুবা ডাইভিং, সি ওয়াকিং সবই চলছে। দ্বীপে কোন কিছুই দেখার নেই। এই নর্থ বে দ্বীপের উত্তর পুর্ব কোনায় একটা লাইট হাউস আছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে দেখাযায়, সবুজের মাঝে লাল সাদা একটা গোল থামের মত। কুড়ি টাকার নোটের পেছনে এই এই ছবি দিয়ে একে বিখ্যাত করা হয়েছে। রসদ্বীপ থেকেও একে দেখেছি। কিন্তু নর্থবে দ্বীপের ঘাটের অবস্থান ঠিক এর উল্টো দিকে ; তাই এখান থেকে ঐ লাইট হাউস দেখা যায়না।

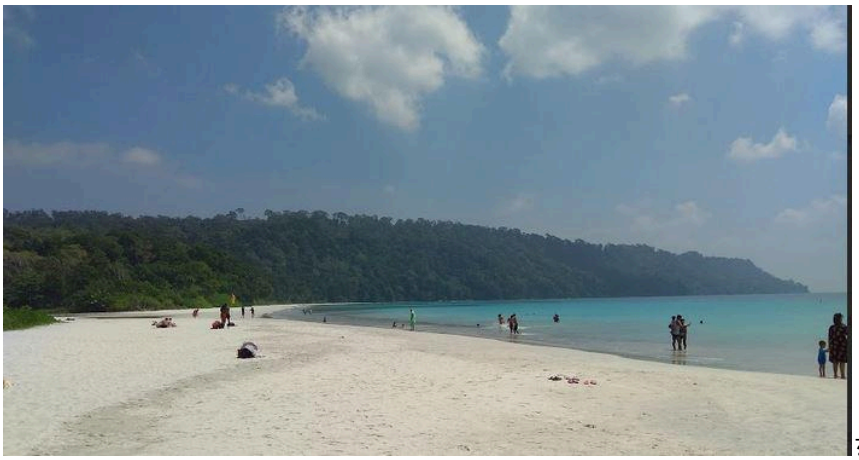
রাধানগর বিচ